৫-৬
দুই খন্ড একত্রে
BELAL
দুর্ধর্ষ
দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

এই সিরিজের পরবর্তী বই

মণিরা ও দস্যু বনহুর
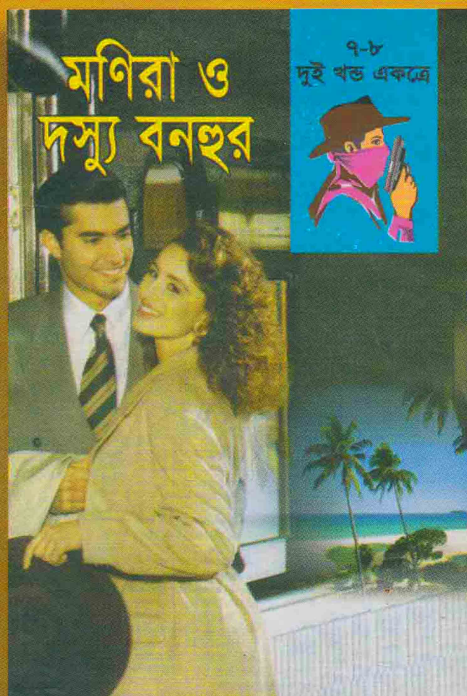
আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন
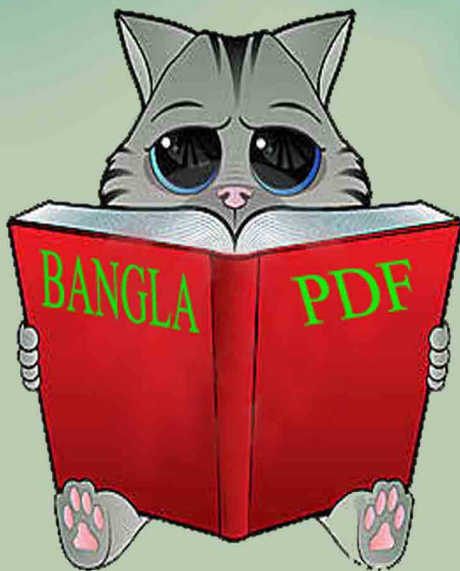
দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর-৫
ছায়ামূর্তি-৬

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ মার্চ, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

মূল্য ৪৫টাকা

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

[ ]

স্মিত হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে ওঠে বনহুর—হ্যাঁ, আমি সন্ন্যাসী বাবাজী। মনিরা, তোমাকে নাথুরামের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আমার এ বেশ।

মনিরার হৃদয়ে অনাবিল এক আনন্দস্রোত বয়ে চলে। ঘন মেঘের অন্তরাল থেকে শশীকলা যেমন পূর্ণ বিকাশ লাভ করে তেমনি মনিরার অশ্রুসিক্ত মলিন বিষণ্ন মুখে স্বর্গীয় এক হাসির আভা ফুটে ওঠে। বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় বুকে। আবেগ ভরা মধুর কণ্ঠে ডাকে—মনিরা!

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে— যাও তুমি ভারী দুষ্ট।

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?

তুমি ভয় পাইয়ে দিলে পাব না? মনির, আজ আমার কি যে আনন্দ, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

দস্যু বনহুর আর মনিরা খাটের উপর গিয়ে পাশাপাশি বসে। কতদিন মনিরা বনহুরকে তার পাশে পায়নি। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে সে তার মুখের দিকে।

বনহুর হেসে বলে— অমন করে কি দেখছ মনিরা।

তোমাকে। কতদিন তোমাকে দেখিনি মনির। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলে— একটিবার দেখাও করলে না আমার সঙ্গে।

উল্টো বলল মনিরা। দেখা করতে গিয়ে দেখা পাইনি। আম্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে চিনতেই পারেননি। আমি পরিচয় দিয়েছিলাম— আমি তোমার সন্তান।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মনিরার মুখমণ্ডল দীপ্তকণ্ঠে বলে সত্যি?

হ্যাঁ।

কি আনন্দ মনির। আমার দেখা না পেলেও তুমি তোমার জননীর সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হয়েছ। তোমার জীবন সার্থক হয়েছে মনির।

হ্যাঁ মনিরা, আম্মাকে আমি সেদিন যেমন করে দেখেছিলাম আর কোনদিন বুঝি অমন করে দেখতে পাব না। কিন্তু জান মনিরা, তোমার জন্য আজ আমার আব্বা আম্মা কি অসহ্য ব্যথা পোহাচ্ছেন?

জানি। কিন্তু মনিরা, লোকসমাজে আজ আমি হেয় হয়ে গেছি -----বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার কণ্ঠ।

বনহুর মনিরার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে— আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি, সবাই জানে, তুমি আমার সঙ্গে চলে এসেছ। পুলিশমহল তাই তোমার সন্ধান করা ছেড়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, এ কথা আমিও মামা-মামীমার কাছে লিখেছিলাম।

তার মানে?

মনির, তুমি এখনও আমার অনেক কিছু জান না। সত্যি তুমি কত মহৎ! কত উন্নত! আমার সম্বন্ধে তোমার মনে এতটুকু সন্দেহের ছোঁয়াচ লাগেনি। কই, তুমিতো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে না?

তোমাকে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই আমি তোমার সম্বন্ধে সব অবগত হয়েছি। মনিরা, তোমার পবিত্র ভালবাসাই যে তার সাক্ষ্য।

অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে মনিরা— মনির! বনহুর ধীরে ধীরে মনিরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, মনিরা, চলো, এবার তোমাকে আব্বা আম্মার নিকটে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুখ তুলে মনিরা, দু'চোখে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বনহুর মনিরার চিবুক উঁচু করে ধরে বলে—কেন চোখের পানি ফেলছ। হাসো, হাসো মনিরা, তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমি দেখতে চাই। হাসো লক্ষ্মীটি।

মনিরার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বনহুর ওকে নিবিড় করে টেনে নেয় কাছে—বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—লক্ষ্মীটি আমার।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে নূরী। দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে ওর। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে—হুর।

বনহুর নূরীকে দেখেই চমকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছকণ্ঠে বলে— নূরী এসো, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই।

নূরী স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে মনিরার দিকে।

মনিরাও নূরীকে দেখে কম আশ্চর্য হয়নি। সে একবার বনহুর আর এক বার নূরীর মুখের দিকে তাকায়। মনে তার অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে ধাক্কা মারে। কে এই যুবতী। বনহুরের সঙ্গে কি এর সম্বন্ধ!

বনহুর নূরী আর মনিরার মাঝখানে দাঁড়ায়, তারপর হেসে বলে— নূরী, এই সেই মনিরা— যার সন্ধানে আমি এবং আমার সমস্ত অনুচর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে নূরী—ব্যস্ত নয়, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলে।

তা তুমি যাই বল—শোনো মনিরা, এ হচ্ছে আমার ছোট বোন নূরী।

মিথ্যে কথা, আমি বোন নই।

অবাক হয়ে চোখ মেলে তাকায় মনিরা বনহুর আর নূরীর মুখের দিকে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তাহলে তুমি কে?

আমি তোমার আজন্ম সঙ্গিনী-সাথী। তুমি এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না হুর। শিশুকাল থেকে তোমাকে আমি দেখে আসছি। সব সময় তুমি আমার পাশে পাশে ছিলে।

তুমি যাই মনে কর নূরী, আমি তোমাকে বোনের মতই মনে করে এসেছি। বনহুর মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মনিরার মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

নূরী আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। দ্রুত বেরিয়ে যায় সেখান থেকে। কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। কিছুক্ষণ বনহুর আর মনিরা কোন কথাই বলতে পারে না।

নিস্তব্ধতা ভাংগে মনিরা, বলে— কি ভাবছ? আমি তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করতে পারব না।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় বুকে—মনিরা।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে অনেক বিশ্বাস করি। মনিরার কণ্ঠ স্বচ্ছ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

এখন বনহুর আর মনিরার যে পোড়োবাড়িতে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল. সে জায়গাটা বনহুরের আস্তানা ছেড়ে দূরে কান্দাইয়া গ্রামে।

একদিন এই কান্দাইয়া বিরাট একটা গ্রাম ছিল। বহু লোকের বাস ছিল এখানে। আজ কান্দাইয়া গ্রাম এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পে গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানে গহন বন। ভূমিকম্পের পর যে কয়েকজন লোক জীবিত ছিল, তারাও বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলো শহরে।

বহুকাল লোকজনের বসবাস না থাকায় কান্দাইয়া গ্রামের নাম কালান্তরে মানব সমাজ থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন কোন কোন বৃদ্ধের মুখে এখনও এ গ্রামের নাম শোনা যায়। দস্যু বনহুর এই গ্রামের একটি পোড়োবাড়িতেই মনিরার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

অবশ্য এই পোড়োবাড়িতে মনিরা একা থাকত না। বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর মনিরার রক্ষার্থে কড়া পাহারায় থাকত। এই তো মাত্র কয়েকদিন— মাঝে মাঝে বনহুরও গোপনে মনিরার সন্ধান নিয়ে যেত। মনিরাকে এখানে আটকে রাখার অবশ্য কারণ ছিল। বনহুর শয়তান নাথুরাম

এবং মুরাদকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মনিরাকে তার মামা-মামীমার নিকট পৌছে দেবার পূর্বেই নূরী এই পোড়োবাড়ির সন্ধান জানতে পারে।

বনহুরের এক অনুচর গোপনে নূরীকে সংবাদ দেয়, তাদের সর্দার একটি যুবতীকে কান্দাইয়া বনের একটি পোড়োবাড়িতে আটকে রেখেছে। যুবতী অন্য কেউ নয়— চৌধুরী কন্যা মনিরা।

কথাটা শোনার পর থেকে নূরীর মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। নূরী যদিও হিংসাপরায়ণ নারী নয়, তবু তার মনে একটা দাহ শুরু হলো। মনিরাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল সে। নূরী সেই অনুচরটির সহায়তায় কান্দাইয়া বনে এসে পৌছল।

বনহুরের বাহুবন্ধনে মনিরা যখন ধরা পড়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নূরী কক্ষে প্রবেশ করে এই দৃশ্য দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে নূরীর স্বপ্নসৌধ ভেংগে চুরমার হয়ে যায়। হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে সেটা সহ্য করতে পারে না নূরী। পোড়োবাড়ি থেকে বেরিয়ে উম্মাদিনীর ন্যায় ছুটতে থাকে।

কিছুটা এগুতেই বনহুরের সেই অনুচর জাফর অশ্ব নিয়ে নূরীর সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়ায়। বলে সে— এভাবে ছুটলে কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছবে? তার চেয়ে অশ্ব নিয়ে বাড়ি যাও।

নূরী কোনদিকে না তাকিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে।

জাফর জিজ্ঞাসা করে— কোথায় যাচ্ছো নূরী?

নূরী ততক্ষণে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। জাফরের কণ্ঠস্বর তার কানে পৌছল কিনা সন্দেহ।

নূরীর কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে অশ্ব নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। সামনে কোন বাধাই তাকে ক্ষান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না।

ঝোপঝাড়, লতাপাতা ডিঙিয়ে, গহন বনের মধ্য দিয়ে উল্কা বেগে ছুটে চলেছে নূরীর অশ্ব। বনহুরকে নূরী প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবাসে। শুধু ভালবাসে না, ওকে সে মনে প্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। নূরী দস্যু কন্যা— বনহুর দস্যু। বনহুর বীর পুরুষ, নূরী বীরঙ্গনা। নূরী সুন্দরী, বনহুর সুপুরুষ—দু'য়ের মধ্যে সোনায় সোহাগায় মিল রয়েছে। অথচ বনহুর নূরী থেকে অনেক দূরে। বনহুরকে সে পাশে পেয়েছে বটে, কিন্তু কোথায় যেন অনেক তফাৎ রয়েছে তাদের মধ্যে।

বনহুর নূরীকে উপেক্ষা করলেও নূরী কোনদিন তাকে অবহেলা করতে পারেনি। বনহুরের উপেক্ষা তার হৃদয়ে আঘাত হেনেছে সত্য, কিন্তু রাগ বা অভিমান কিছুই করেনি সে।

বনহুরের কর্মক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেছে নূরী। হাসিভরা মুখে সে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে, কিন্তু আজ নূরী বনহুরকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। রাগে অভিমানে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার হৃদয়। বনহুর যে অন্য কোন নারীকে কোনদিন ভালবাসতে পারে, এ যেন তার কল্পনার বাইরে।

নূরীর অশ্ব উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। বন-প্রান্তর ছাড়িয়ে শহরের পথের ওপর এসে পড়ে নূরী।

পথ দিয়ে নূরী যখন অশ্ব চালিয়ে চলেছিল, তখন পথের দু'ধারে জনগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল। অন্যান্য যানবাহন বাধ্য হচ্ছিল নূরীকে পথ ছেড়ে দিতে। কে এ যুবতী— কোথায় চলেছে— কি এর উদ্দেশ্য, কেউ জানে না।

শেষ পর্যন্ত নূরীর অশ্ব একেবারে পুলিশ অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নূরী অশ্ব থেকে নেমে দ্রুত প্রবেশ করল।

মিঃ হারুন তখন কি একটা কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। মিঃ হোসেন নূরীকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলেন। কারণ, নূরীর বেশ স্বাভাবিক মেয়েদের মত নয়। তার পরনে ঘাগড়া, গায়ে কামিজ। একটা ওড়না মাথার উপর দিয়ে গলায় জড়ানো। লম্বা দুটো বিনুনী ঘাড়ের দু'পাশে ঝুলে রয়েছে। কতকটা ইরানী মেয়েদের মত তার শরীরের পোশাক।

মিঃ হোসেনকে দেখে নূরী প্রথমে থমকে দাঁড়ায়। ভয়ও পায় সে। হঠাৎ কি বলবে ভেবে পায় না। নূরী পুলিশের লোককে তেমন করে দেখেনি কোনদিন। তা ছাড়া পুলিশের ড্রেস নূরীর চক্ষুশূল। অবশ্য এর কারণ আছে। সে দস্যুকন্যা— পুলিশকে তাই সে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করতে পারে না।

মিঃ হোসেন জিজ্ঞাসা করেন— কে তুমি? কি চাও?

মিঃ হোসেনের কথায় চোখ তুলে তাকান মিঃ হারুন। নূরীকে দেখে তিনিও অবাক হন। প্রশ্নভরা চোখে তাকান তিনি নূরীর দিকে।

নূরী একটা ঢোক গিলে বলে—ইন্সপেক্টার সাহেব, আমার সঙ্গে আসুন— শীঘ্র আসুন, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে আপনাদের সাহায্য করব।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন মিঃ হোসেন এবং মিঃ হারুন—দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ। স্তব্ধ কণ্ঠে বলে নূরী।

পুলিশ অফিসের সমস্ত লোক থ'হয়ে যায়। সকলেরই চোখে মুখে একটা আতঙ্কভাব ফুটে ওঠে।

এগিয়ে আসেন মিঃ হারুন— তুমি কে যুবতী? তোমার পরিচয়?

নূরী ইতস্ততঃ করে বলে— আমাকে দস্যু বনহুর ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি। আপনারা আর বিলম্ব করবেন না। তাড়াতাড়ি চলুন, সেখানে আর একটি মেয়েকেও উদ্ধার করতে পারবেন।

মিঃ হারুন মিঃ হোসেনকে নির্দেশ দিলেন অতি শীঘ্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে তৈরি হতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন তাঁর দলবল এবং পুলিশ ফোর্স নিয়ে কান্দাইয়া বনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনের মধ্যে কয়েকটা কথাবার্তা হলো। মিঃ হোসেন বললেন—সেখানে যে যুবতী রয়েছে, সেই যে চৌধুরীকন্যা মিস মনিরা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হারুন বললেন— আজ যদি আমরা ঠিকভাবে সেখানে পৌছতে সক্ষম হই, তাহলে এক ঢিলে দু'পাখি মারা হবে। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা হবে এবং চৌধুরী সাহেবের ভাগনী মিস মনিরাকে উদ্ধার করাও হবে।

নূরী নিজের অশ্ব চেপে পুলিশগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যদিও তার হৃদয়ে ঝড় বইছে তবু সে এতটুকু বিচলিত হলো না।

মিঃ হারুন দলবল নিয়ে অতি সাবধানে চলতে লাগলেন। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা সহজ কথা নয়। কৌশলে তাকে বন্দী করতে হবে।

এক সময় তারা কান্দাইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গহন বন। ঘন অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন। হিংস্র জন্তুর কবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল পুলিশ ফোর্স।

❑

মনিরা বীণা বাজিয়ে চলেছে। তার বীণার অপূর্ব ঝঙ্কারে গোটা বনভূমি মোহিত হয়ে উঠেছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুর মনিরার মুখের দিকে। অর্ধ শায়িত অবস্থায় শুয়ে আছে বনহুর।

মনিরার বীণার সুর তার হৃদয়ে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। সে এক স্বপ্নময় রাজ্যে চলে গিয়েছে। সেখানে শুধু সে আর মনিরা।

মনিরাকে তার মামা-মামীর নিকট পৌছে দেবার পূর্বে বনহুর একবার ওর হাতে বীণা জানো শুনতে চেয়েছিল। মনিরা ওর এ অনুরোধ অবহেলা করতে পারেনি।

মনিরা আজ তার অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বীণার ঝঙ্কার তুলেছিল। মনের গোপন কথা সে ব্যক্ত করছিল বীণার সুরে সুরে।

বনহুরের গভীর নীল দু'টি নয়নে মায়াময় চাহনি। নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল মনিরাকে।

হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে নূরী, পেছনে উদ্যত রিভলভার হাতে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন। আরও প্রবেশ করে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ। সকলেরই হাতে উদ্যত রাইফেল।

বনহুর দ্রুত সোজা হয়ে বসে।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরার হাতে বীণার সুর থেমে যায়।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন বনহুরের দুই পাশে গিয়ে দাঁড়ান, রিভলভার উদ্যত করে বলেন—হ্যান্ডস আপ।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী রাইফেল উদ্যত করে দস্যু বনহুরকে ঘিরে ধরেছে।

বনহুর একবার তাকাল নূরীর মুখের দিকে। তারপর তাকাল মিঃ হারুন আর মিঃ হোসেনের দিকে।

মনিরার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। সে তাকিয়ে দেখল বনহুরের মুখে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। পূর্বের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত তার মুখোভাব। এতটুকু বিচলিত হয়নি সে।

আচমকা এ অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বনহুর। নইলে পুলিশ ফোর্সের সাধ্য কি তাকে গ্রেফতার করে? নিরস্ত্র বনহুর— কিন্তু সে অসহায় নয়।

মিঃ হারুনের ইংগিতে মিঃ হোসেন বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

বনহুরের হাতে যখন মিঃ হোসেন হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলে। হৃদয়টা যেন ভেংগে খান খান হয়ে যাচ্ছিল, ওর আংগুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, সকলের অজ্ঞাতে। পেছন থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সে।

চারদিকে ঘিরে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হাতে বনহুরকে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

মিঃ হারুন মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন চলুন আপনার মামা মামীর নিকটে পৌঁছে দিই।

মনিরার চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব ফুটে উঠেছিল। এতক্ষণ সে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে সব দেখছিল। মিঃ হারুনের কথায় চমক ভাংগে। একবার নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মিঃ হারুনকে অনুসরণ করে।

সবাই কক্ষ ত্যাগ করতেই আড়ালে দাঁড়িয়ে নূরী উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেংগে পড়ে। ভাবে, একি করল। রাগের বশে একি করল সে, দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিড়তে থাকে সে।

নূরী কৌশলে বনহুরের পাহারাদারগণকে সরিয়ে ফেলেছিল। নইলে তারা এত সহজে পুলিশকে পোড়োবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে দিত না।

বনহুরকে নিয়ে পুলিশবাহিনী এক সময় পোড়োবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের পাহারাদারগণ উপস্থিত হলো সেখানে। সংখ্যায় তারা অতিঅল্প— তবু আক্রমণ করল পুলিশবাহিনীকে।

দু'দিক থেকে চলল গুলি বিনিময়।

অসংখ্য পুলিশফোর্সের সাথে মাত্র কয়েকজন দস্যুর পেরে ওঠা অসম্ভব। বনহুরের অনুচর কয়েকজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিহত হলো। একজন আত্মগোপন করে ছুটলো বনহুরের আস্তানার দিকে—রহমানকে খবরটা জানাতে।

দস্যুগণের গুলিতেও কয়েকজন পুলিশ নিহত হলো এবং মিঃ হোসেনের দক্ষিণ হাতখানা গুরুতর আহত হলো।

এবার পুলিশ ফোর্স বনহুরকে নিয়ে বন পেরিয়ে একটা ফাঁকা স্থানে এসে পৌছল। সেখানেই অপেক্ষা করছিল পুলিশ ভ্যানগুলো।

পাঁচখানা গাড়ি সেখানে প্রস্তুত ছিল।

সম্মুখে এবং পেছনে দু'খানা করে পুলিশ ভ্যান। প্রত্যেকটা গাড়িতে দশজন করে পুলিশ দাঁড়িয়ে রইলো উদ্যত রাইফেল হাতে।

মাঝখানের গাড়িতে মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন, মনিরা এবং দস্যু বনহুর রয়েছে

মিঃ হোসেনের দক্ষিণ হাতে গুলি বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সামনের আসনে অতি কষ্টে বসে রইলেন, প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতই হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পেছনের আসনে দস্যু বনহুর—হাতে তার হাতকড়া, পাশেই উদ্যত রিভলভার হাতে মিঃ হারুন।

পাঁচখানা গাড়ি একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। যেন বিশ্ব বিজয় করে তারা ফিরে চলেছে।

মিঃ হারুনের মনে অফুরন্ত আনন্দ। যে দস্যুকে গ্রেফতার করার জন্য অহরহ পুলিশবাহিনী উম্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করছে—পুলিশ সুপার নিজে যাকে গ্রেফতারের জন্য কাজে নেমে পড়েছিলেন সেই দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে নিয়ে চলেছেন তিনি! দুনিয়া জয়ের আনন্দ আজ তাঁর মনে।

❑

জনহীন পথ।

দু'ধারে শাল আর সেগুন গাছের সারি। পথের পাশে মাঝে মাঝে ঘন বনও রয়েছে। প্রায় মাইল দশেক চলার পর তারা শহরে গিয়ে পৌঁছবে।

এই দশ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

মাঝে মাঝে দু'একটা পথ বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে এদিকে সেদিকে। হয়ত দূর-দূরান্তে কোন গ্রামের দিকে।

দস্যু বনহুর নিশ্চুপ বসে রয়েছে। হাতে তার হাতকড়া পরানো, মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ললাটের চারপাশে। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে সে গাড়ির বাইরের দিকে। কে বলবে সে দস্যু, অতি ভদ্রজনের মত নিশ্চুপ বসে আছে!

মনিরা মিঃ হারুনের পাশে জড়োসড়ো হয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মুখোভাব তার স্বচ্ছ নয়। মনের দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে তার মুখে।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে মনিরা।

হঠাৎ বনহুরের কণ্ঠস্বরে মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরে তাকায় সে।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—খবরদার! একটু নড়লে কিংবা চিৎকার করলে মরবেন।

মনিরা দেখল, বনহুর হাতকড়া পরা হাতেই মিঃ হারুনের পাঁজরে রিভলভার চেপে ধরেছে। কখন যে অতর্কিতভাবে সে মিঃ হারুনের হাত

থেকে রিভলভারখানা কেড়ে নিয়েছিল কেউ টের পায়নি। সে আরও দেখল, মিঃ হারুনের চোখেমুখে উৎকণ্ঠতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি না পারছেন নড়তে, না পারছেন চিৎকার করতে। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুরের কণ্ঠস্বরে ড্রাইভারও ফিরে তাঁকিয়ে দেখে নিল। মুহূর্তে তার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করল। দস্যু বনহুরের হাতে রিভলভার, এ কম কথা নয়। ভয়কম্পিত হাতে গাড়ি চালাতে লাগল সে। তাঁর মুখ দিয়েও চিৎকার বের হলো না। হঠাৎ যদি দস্যু তার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। কাজেই সে নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলল।

বনহুর পূর্বের ন্যায় কঠিন চাপা কণ্ঠে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল– ড্রাইভার সামনে বাম দিকে যে পথটা গেছে সেই পথে গাড়ি নাও– নইলে মৃত্যু।

মনিরা তাকালো সম্মুখে। ঐ তো একটু সামনেই আর একটা পথ বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে চলে গেছে বামদিকে। সরু পথটার দু'ধারে ঘন বন।

মনিরা নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে দেখল, তাদের গাড়ির আগের দু'খানা গাড়ি সোজা চলে গেল– সঙ্গে সঙ্গে তাদের গাড়ি থেমে পড়লো সরু রাস্তায়। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড– পেছনের গাড়ি দু'খানা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বনহুরের গাড়িখানা তখন সাঁ সাঁ করে ঢালু রাস্তায় নেমে যাচ্ছে।

বনহুর তখনও রিভলভার মিঃ হারুনের বুকে চেপে ধরে আছে। পেছনের গাড়ি দু'খানা থেমে হুইসেল দিতেই সামনের গাড়ি দু'টিও থেমে পড়ে এবং অতি দ্রুত বনহুরের গাড়িখানাকে অনুসরণ করে। এক সঙ্গে চারটি পুলিশ ভ্যান ছুটলো। সামনের গাড়িটাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুড়তে সাহসী হলো না। কারণ, গাড়িতে রয়েছে দু'জন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং চৌধুরী সাহেবের ভাগনী মিস মনিরা।

সামনের গাড়িখানা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

মিঃ হারুন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করছেন। মিঃ হোসেনের অবস্থা শোচনীয়। দক্ষিণ হাতখানা গুলির আঘাতে ঝুলে পড়েছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে– তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ক্রমে যেন তাঁর জ্ঞান লোপ পাচ্ছে।

ড্রাইভারের হৃদকম্পন শুরু হয়েছে। সে কোনরকমে গাড়ির গতি ঠিক রেখে গাড়ি চালাচ্ছে। কোন মুহূর্তে বনহুরের গুলি তার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে বেরিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

মনিরার অবস্থা অবর্ণণীয়। কোন্ সময়ে যে গাড়িখানা উল্টে যাবে। এখন পথের একধারে গভীর খাদ, আরেক ধারে গহন বন। নিজের জন্য চিন্তা করে না মনিরা—ভয় বনহুরের জন্য।

কিন্তু বনহুরের তখন কিছু ভাববার সময় নেই। দস্যু মনোবৃত্তি জেগে উঠেছে তার অন্তরে।

হঠাৎ গাড়িখানা আচমকা থেমে যায়।

মনিরা তাকিয়ে দেখে মিঃ হারুনের পাশে বনহুর নেই। পাশের জঙ্গলের কিছুটা শুধু নড়ে ওঠে একবার।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হারুনের কণ্ঠ তার কানে এসে পৌঁছে—দস্যু বনহুর পালিয়েছে। দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

পেছনে অসংখ্য রাইফেল একসঙ্গে গর্জে ওঠে।

মনিরা তাকিয়ে দেখল, পেছনে চারখানা পুলিশ ভ্যান সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবগুলো ভ্যান থেকে পুলিশবাহিনী রাইফেল উদ্যত করে তীরবেগে ছুটে আসছে।

মনিরার হৃদপিণ্ড ধক্ ধক্ করে ওঠে। দুর্ভাবনায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। না জানি বনহুরকে ওরা আবার ধরে ফেলবে কিংবা হত্যা করে ফেলবে।

পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করে মিঃ হারুন আদেশ দিলেন গোটা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে। দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করে নিয়ে যেতেই হবে। নিজেও মিঃ হোসেনের রিভলবার নিয়ে নেমে পড়লেন।

কিন্তু কোথায় বনহুর। খুঁজে হয়রান-পেরেশান হয়ে পড়লেন মিঃ হারুন এবং তাঁর দলবল।

এদিকে বেশি দেরী করাও চলে না, কারণ মিঃ হোসেনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। শীঘ্র তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন।

কাজেই বিলম্ব করা আর মোটেই উচিত নয়।

❑

মনিরাকে নিয়ে মিঃ হারুন যখন চৌধুরী বাড়ি পৌঁছলেন, তখন রাত প্রায় বারোটা বেজে গেছে। দু'জন পুলিশসহ মনিরাকে নিয়ে তিনি হাজির হলেন।

ওদিকে মিঃ হোসেনের চিকিৎসার জন্য তাঁকে পুলিশ হসপিটালে পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশদের ক্যাপ্টেনকে বলে দিলেন তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা যেন তিনি করেন।

চৌধুরী সাহেব সবেমাত্র শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বয় ছুটে আসে– স্যার, আপামণি এসেছেন। আর তার সঙ্গে এসেছেন ইন্সপেক্টার সাহেব।

কথাটা কানে যেতেই চৌধুরী সাহেব কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি চঞ্চল কণ্ঠে বললেন— কোথায় সে? ওগো, যাও না– মা– মণি এসেছে।

শুনেছি কিন্তু–

না, না, কিন্তু নয়, যাও; দেখ একবার। ওরে বাবলু যা, ওকে আমার কাছে ডেকে আন।

বাবুল ছুটলো নীচে।

মরিয়ম বেগম স্বামীর হাত ধরে টেনে তুলে দিলেন— যাও তুমি।

চৌধুরী সাহেব অগ্যতা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। মনিরা এবং মিঃ হারুন হলঘরের মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চৌধুরী সাহেবকে দেখে মিঃ হারুন বললেন– গুড নাইট চৌধুরী সাহেব। এই নিন আপনার ভাগ্নী মিস মনিরা।

চৌধুরী সাহেব ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন মনিরার দিকে, কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন– বসুন।

মিঃ হারুন বললেন– না চৌধুরী সাহেব, আজ আর বসব না। আপনার গুণধর পুত্র আমাদের সবাইকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে—কথা শেষ না করেই দ্রুত বেরিয়ে যান তিনি।

চৌধুরী সাহেব আর দাঁড়ান না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যান।

কখন যে মরিয়ম বেগম সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হয়ে যায়। তারপর নিচে নেমে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন মনিরাকে–মা! কোথায় গিয়েছিলি তুই?

মনিরা মামীকে আঁকড়ে ধরে আকুলভাবে কেঁদে ওঠে। এত দিনের রুদ্ধ কান্না বাঁধ-ভাংগা জোয়ারের পানির মত বেরিয়ে আসে।

মরিয়ম বেগম কন্যা-সমতুল্য মনিরার চোখের পানি সহ্য করতে পারেন না। তিনিও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। তারপর মনিরাকে নিয়ে উঠে আসেন উপরে।

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মরিয়ম বেগম— আমাদের না বলে অমন করে কেন চলে গিয়েছিলি মা? তোর মামা-মামীর কথা একটুও ভাবিসনি? কেঁদে কেঁদে আমরা অন্ধ হয়ে গিয়েছি?

মনিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, মামীমা! আমার কোন দোষ নেই।

তা জানি, সব জানি। ঐ হতভাগ্য নিজেও মরেছে, তোরও সর্বনাশ করেছে। ওর কোন মঙ্গল হবে না।

না, না, তুমি ওকে অভিসম্পাদ কর না মামীমা। তুমি ওকে অভিসম্পাত কর না। ওর কোন অপরাধ নেই। তোমার মনির অতি মহান!

মনিরা।

হ্যাঁ মামীমা, আমাকে সে নিয়ে যায়নি, বা আমি নিজেও তার সাথে যাইনি।

তবে? তবে যে তোর চিঠি।

ও চিঠি আমার নয় মামীমা।

কি বললি, ও চিঠি তোর নয়?

আমার হাতের লেখা, কিন্তু আমার কথা নয়।

এ তুই কি বলছিস মনিরা?

হ্যাঁ মামীমা, ও চিঠি আমাকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়েছে।

কে—ঐ পাঁজি মনিরটা বুঝি?

না। সে অন্য এক শয়তান।

কে? সে কে মনিরা?

যারা আমাকে সেদিন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার নাম শয়তান মুরাদ- তোমাদের সেই জামাতা।

খান বাহাদুরের ছেলে মুরাদ?

হ্যাঁ।

তাই তো বলি এতবড় সর্বনাশ আমার মনির করবে! দাঁড়া— এক্ষুণি তোর মামাকে সব বলি।

না, না, মামীমা এসব তুমি আর কারও কাছে বল না, এতে আমার কলঙ্ক বাড়বে। সবাই জানে-আমি তোমাদের সন্তান দস্যু বনহুরের সঙ্গে গিয়েছি। তাই জানুক- সে কলঙ্ক হবে আমার অঙ্গের ভূষণ।

মনির এ কথা যদি জানতে পারে—তোকে অন্য একজন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল?

সে সব জানে। তোমাদের কোন ভয় নেই মামীমা। সেই তো আমাকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

সত্যি!

সব সত্যি। মামীমা, আমায় কিছু খেতে দাও। তারপর তোমার বিছানায় শুয়ে সব বলছি।

মরিয়ম বেগম তাড়াতাড়ি ঘরে যা ছিল এনে মনিরাকে খেতে দিলেন।

মনিরা খেতে খেতে বলল—কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি।

খাওয়া শেষ করে মামীমার পাশে শুয়ে সমস্ত কথা এক এক বলে গেল মনিরা।

❑

পুলিশ ভ্যানগুলো দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বনহুর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে — হাঃ হাঃ হাঃ–

সে হাসির প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ বনভূমি প্রকম্পিত করে তোলে। গাছের পাতাগুলো যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। পাখিগুলো উড়ে উঠে আকাশে।

বনহুরের হাতে তখনও হাতকাড়া পরানো। দক্ষিণ হাতে মিঃ হারুনের সেই রিভলভারখানা ধরা রয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হিংস্র জন্তু যেমন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে, তেমনি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে দস্যু বনহুর!

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে।

বনহুর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকায় চারদিকে। এখন যে কোন উপায়ে প্রথম তাকে হাত দু'খানা মুক্ত করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

মাথা নিচু করে ভাবছে, এমন সময় তার কানে ভেসে আসে অশ্ব পদশব্দ। চমকে ফিরে তাকায় বনহুর। দেখতে পায়, যে পথের ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে সেই পথ বেয়ে একজন অশ্বারোহী দ্রুত এগিয়ে আসছে।

বনহুর চট করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। অশ্বারোহী ক্রমান্বয়ে পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে, বড় রাস্তার দিকেই যাবে সে।

অশ্বারোহী নিকটবর্তী হতেই বনহুর সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে দেখল, অশ্বারোহীর পিঠে একটা বন্দুক বাঁধা রয়েছে। লোকটার শরীরে শিকারীর ড্রেস। কয়েকটা পাখিও ঝুলছে অশ্বের সম্মুখ ভাগে। বিভীষিকাময় রাত্রির আগমন আশঙ্কায় অশ্বারোহী দ্রুত অশ্ব চালনা করছিল।

বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যে কোন উপায়ে এই অশ্বারোহীকে রুখতে হবে।

শিকারী অতি নিকটে পৌঁছে গেছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে বনহুর। অশ্বারোহী তার সম্মুখে আসতেই বনহুর রিভলভার উঁচু করে ধরে চিৎকার করে ওঠে– থামো।

সম্মুখে ভূত দেখার মত চমকে উঠে অশ্বারোহী। ভয়ে থর থর করে কেঁপে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড। বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর মুখমণ্ডল। অশ্বের লাগাম টেনে ধরে অশ্ব থামিয়ে ফেলে।

বনহুর রিভলভার উদ্যত করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে—ভয় নেই, আমি তোমাকে হত্যা করব না।

শিকারীর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বনহুরের হাতে হাতকড়া লাগানো দেখেই বুঝতে পারে—এ লোকটি নিশ্চয়ই কোন পলাতক আসামী।

কিন্তু বনহুর শিকারীকে বন্দুকে হাত দিতে দেয় না। বলে ওঠে– খবরদার! ওটাতে হাত দিয়েছ কি মরেছ?

অগত্যা শিকারী ফ্যাকাশে মুখে বলে ওঠে—তুমি কি চাও? আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।

টাকা পয়সা আমি চাই না—চাই তোমার অশ্ব।

অশ্ব!

হ্যাঁ। কিন্তু একেবারে চাই না—আবার তুমি ফেরত পাবে। বিষণ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে শিকারী –তাহলে আমার ব্যবস্থা কি হবে?

তুমি যদি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার কর, তাহলে কথা শেষ না করেই বনহুর দ্রুত পাশের একটা টিলার মত উঁচু জায়গায় উঠে লাফিয়ে পড়ল অশ্বের পিঠে শিকারীর পেছনে। রিভলভার শিকারীর পিঠে চেপে ধরে— চালাও।

অশ্ব আবার ছুটতে শুরু করে।

সরু রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো তারা।

সম্মুখে ভয়বিহ্বল শিকারী পেছনে দুর্ধর্ষ, দস্যু বনহুর।

প্রায় ঘণ্টা কয়েক চলার পর একটি পল্লীর নিকটে এসে পৌছল ওরা। এবার বনহুর শিকারীর পিঠ থেকে বন্দুকখানা খুলে নিয়ে সামনের জলাশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল। তারপর ওকে অশ্ব থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল– আগামীকাল তুমি এই স্থানে অপেক্ষা করবে, আমি তোমার অশ্ব ফেরত দেব। কিন্তু মনে রেখ, কোনরকম চালাকি করতে গেলে মরবে।'আমি ক্ষমা করব না।

শিকারী স্তব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

বনহুর একটু হেসে জবাব দিল-— দস্যু বনহুর।

শিকারী চমকে দু'পা পিছিয়ে গেল, তার কণ্ঠ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের হলো—দস্যু বনহুর!

বনহুর ততক্ষণে অশ্ব ছুটিয়ে চলেছে।

শিকারীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

বনহুর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই শিকারী ভদ্রলোক ছুটল লোকালয়ের উদ্দেশ্যে। যে দস্যু বনহুরের ভয়ে আজ দেশময় ত্রাহি ত্রাহি ভাব, সেই সেই দস্যু বনহুর আজ তাকে স্পর্শ করে গেল এমনকি একই অশ্বে এতদূর এসেছে তারা দু'জনে।

শিকারী যখন লোকালয়ে পৌছে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, তখন দস্যু বনহুর এক কর্মকারের বাড়ির দরজায় গিয়ে নেমে দাঁড়াল।

গভীর রাত। সবাই ঘুমে অচেতন।

কর্মকার সারাদিনে ক্লান্তির পর ছেড়া কাঁথার নিচে গা মুড়ি দিয়ে সুখনিদ্রা উপভোগ করছে।

এমন সময় বনহুর তার পাশে এসে দাঁড়াল। রিভলভারের ডগা দিয়ে মুখের কাঁথা সরিয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মকারের সুখনিদ্রা ছুটে গেল, চোখ মেলে তাকিয়ে অপরিচিত এক ব্যক্তিকে তার কক্ষে দেখে ত্বরিতগতিতে বিছানায় ওঠে বসল।

কর্মকার কিছু বলার পূর্বেই বনহুর রিভলভার উঁচু করে ধরল।

কর্মকার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে কিছু বুঝতে না পেরে হা করে তাকিয়ে রইল। ভাবল, স্বপ্ন দেখছে না তো– দু'হাতে চোখ রগড়ে ভাল করে তাকাল।

বনহুর বলে উঠল—ওঠো।

কর্মকার চিত্রাপিত্যের ন্যায় উঠে দাঁড়াল। বারবার তাকাতে লাগল বনহুরের হাতের রিভলভারখানার দিকে।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বলল—এই যে- আমার এ দুটো খুলে দাও।

কর্মকার এতক্ষণে বনহুরের হাতের হাতকড়ার দিকে নজর করেনি। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। ভাবলো নিশ্চয়ই এ ভাল লোক নয়, কোন কয়েদী, পালিয়ে এসেছে তার কাছে।

কর্মকারের দু'চোখ গোলাকার হয়ে ওঠে। সে জানে পলাতক কয়েদী ধরে দিলে পুরস্কার পাওয়া যায়। হয়তো কোন চোর কিংবা ডাকু হবে। মোটা পুরস্কার পাবে সে। তার মুখটা হাসিমাখা করে বলল, কে তুমি বাবা?

বনহুর কর্মকারের মুখোভাব দেখে তার মনের ভাব বুঝেছিল, হেসে বলল— আমি একজন পলাতক আসামী। দেখো ভাই, আমার হাতের এ দুটো খুলে দাও। আর একটু থাকার জায়গা যদি দিতে।

তা আর বলতে হবে না। আমরা হিন্দু, অতিথি আমাদের কাছে দেবতার সমান।

বেশ, তাহলে আমার হাতের এ দুটো খুলে দাও।

বনহুর কর্মকারের বুকের কাছ থেকে রিভলভারখানা সরিয়ে নিয়েছিল। কর্মকার বনহুরকে নিয়ে তার কারখানার মধ্যে প্রবেশ করল কিছুক্ষণ পরিশ্রম কারার পর বনহুরের হাত দু'খানা মুক্ত হয়ে আসে।

হাত দু'খানাতে হাত বুলিয়ে বলে বনহুর—এর জন্য তুমি পুরস্কার পাবে। এবার আমার শোবার জায়গা করে দাও দেখি।

কর্মকারের আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে বলে—হাতকড়া খুলে দিয়েছি বলেই তোমাকে ছাড়ছিনে বাছাধন। কিন্তু প্রকাশ্যে বলে—এসো বাবা এসো, এই যে আমার বিছানায় শোও, আমি ভিতরে গিয়ে শুই।

আচ্ছা! বনহুর কর্মকারের তেলচিটে বিছানায় শুয়ে কাঁথাটা টেনে দিল চোখেমুখে। তারপর কাঁথার নিচে বারবার হাই তুলে বলল—তুমি যাও, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।

কর্মকার বেরিয়ে যাবার পূর্বে আর একবার বলে—তুমি বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোও। কাল ভোরে ডেকে দেব।

বনহুর কাঁথার নিচে থেকে বলে—আচ্ছা।

কর্মকার বেরিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। বনহুর শুনতে পেল শিকলটাও আটকে দিল সে।

দরজা বন্ধ হবার সংগে সংগে কাঁথা সরিয়ে দরজার পাশে এসে কান পেতে শুনতে লাগল বনহুর।

ওপাশ থেকে ভেসে আসছে কর্মকারের চাপা কণ্ঠস্বর–ওগো, ওঠো–ওঠো!

মেয়েলী কণ্ঠ – বলি এত রাতে কি হলো তোমার?

শোনো, একটা কয়েদী পালিয়ে এসেছে।

তাতে আমার কি?

তোমার কি, শোনোই না! ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে কি পাব জান?

কি পাবে?

গভর্ণমেন্ট আমাকে মোটা পুরস্কার দেবে। অনেক টাকা—বুঝেছ?

বুঝেছি। কিন্তু কয়েদী কোথায়?

ঐ যে আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে। আমার নরম বিছানায়, গরম কাঁথার নিচে ঐ শোনো নাক ডাকছে। দেখো, তুমি চুপ করে এই দরজার পাশে থাক। আমি চট করে থানায় খবরটা দিয়ে আসি।

সে কি গো! খবরটা দিয়ে আসবে, না পুলিশ নিয়ে আসবে?

হ্যাঁ, পুলিশকে একেবারে সংগে করে নিয়ে আসব। তুমি এখান থেকে নড়ো না, বুঝেছ?

হ্যাঁ গো বুঝেছি। যাও, চট করে এসো কিন্তু। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আরে রেখে দাও তোমার ঘুম, দেখো দরজা যেন আবার খুলে দিও না।

না গো না, দেব না—দেব না।

চটি জুতা পায়ে বেরিয়ে যাবার শব্দ শোনা যায়।

বনহুর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে।

একটা কাগজে নিজের নাম লিখল বনহুর। তারপর বিছানার ওপর রেখে পেছনের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার সরু শিকগুলোতে হাত দিয়ে মৃদু হাসলো সে। মাত্র কয়েক মিনিট–বনহুর জানালা দিয়ে ঘরের পেছনে বেরিয়ে এলো। অদূরে অশ্বটা ঘাস চিবুচ্ছিল। বনহুর বিলম্ব না করে অশ্বে চেপে বসল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অঞ্চলের থানার ছোট দারোগা মিঃ হাকিম আর কয়েকজন পুলিশ কর্মকারের সংগে এসে হাজির হলেন।

কর্মকার এসে দেখে তার বৌ দরজার পাশে আঁচল বিছিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমাচ্ছে।

দারোগা সাহেবকে বলল কর্মকার—হুজুর এই ঘরে কয়েদীকে আটকে রেখেছি। আমার কাছ থেকে পালাবে এমন বেটা আছে নাকি? দাঁড়ান, দরজা খুলে দিই। কর্মকার নিজ হাতে দরজা খুলে ফেলল।

দারোগা, জমাদার এবং পুলিশ একসংগে কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু একি, কোথায় কয়েদী! শূন্য বিছানা পড়ে রয়েছে।

ছোট দারোগা মিঃ হাকিম ধমক দিলেন—কোথায় কয়েদী? পাঁজি কোথাকার। জানিস মিথ্যে বলার শাস্তি কি?

কর্মকার কাঁপতে কাঁপতে বলল— হুজুর মিথ্যে বলিনি। আমরা হিন্দু, এই যেন কান ধরে বলি..........

কর্মকারের কথা শেষ হয় না। একজন পুলিশ উবু হয়ে বিছানা থেকে কাগজখণ্ড তুলে নিয়ে লণ্ঠনের সম্মুখে ধরে চিৎকার করে উঠলেন— দস্যু বনহুর।

মিঃ হাকিম অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠেন—কোথায় দস্যু বনহুর?

এই দেখুন স্যার। জমাদার সাহেব কাগজের টুকরাখানা এগিয়ে দেন মিঃ হাকিমের দিকে।

কাগজখানা নিয়ে পড়ে দেখলেন তিনি, তারপর একটা শব্দ করলেন–আশ্চর্য, দস্যু বনহুর এসেছিল এখানে।

কর্মকার তখন কাঁপতে শুরু করেছে। দস্যু বনহুরের হাতের হাতকড়া সে নিজ হাতে খুলে দিয়েছে, এও কি সত্য?

তাকে আবার বন্দীও করে রেখে গিয়েছিল সে। কি সর্বনাশটাই না করেছি। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাকে ক্ষমা করবে না। হয়তো তাকে হত্যাও করতে পারে। কর্মকার কেঁদেই ফেলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ভিড় জমে গেল।

মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল, কর্মকার জয়নাথ দস্যু বনহুরকে আটকে রেখেছিল—এ কম কথা নয়।

ওদিকে শিকারী গ্রামের কয়েকজন লোককে সংগে করে শহরে গিয়ে পৌঁছল। সোজা গেল সে পুলিশ অফিসে।

সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের কাছে। আগামী রাতে সেই স্থানে তার অশ্বটি ফেরত দিতে আসবে দস্যু বনহুর—এ কথাও বলতে ভুলল না।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন সব শুনে বুঝতে পারলেন, কাল তারা যখন দস্যু বনহুরকে খুঁজে না পেয়ে চলে এসেছিলেন, ঠিক তার পরপরই ঐ শিকারী ভদ্রলোক অশ্ব ছুটিয়ে সেই পথে আসছিল এবং তারপর এসব ঘটনা সেখানে ঘটছে।

গোপনে মিঃ হারুন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের নতুন ফন্দি আঁটলেন।

যে স্থানে অশ্বটি ফেরত দেবার কথা আছে সেই জায়গায় এক গোপন স্থানে কিছুসংখ্যক পুলিশ লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন, শিকারীও অশ্ব ফেরত নেয়ার জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে।

পুলিশমহল যখন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে কর্মকারসহ মিঃ হাকিম এসে হাজির হলেন পুলিশ অফিসে।

গত রাতের ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন— কর্মকারের মুখেও সব শুনলেন মিঃ হারুন। দস্যু বনহুর স্বয়ং কর্মকারের নিকট পৌঁছে হাতের হাতকড়া কেটে নিয়েছে কম কথা নয়। রাগে অধর দংশন করলেন তিনি।

বনহুরের সেই পালিয়ে আসা অনুচরটির মুখে বনহুরের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে রহমান বোমার মত ফেটে পড়ল; এত বড় কথা—তাদের সর্দারকে পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে গেছে? ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে লাগল রহমান।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত অনুচরকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল– যেমন করে হউক পুলিশদের হাত থেকে সর্দারকে মুক্ত করে আনতেই হবে, কিন্তু সেই আহত অনুচরটি রহমানের নিকটে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে অনেক বিলম্ব করে ফেলেছিল। একে তার পায়ে চোট লেগেছিল, তদুপরি কান্দাইয়ার বন থেকে বনহুরের আস্তানা অনেকটা পথ। কাজেই বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রহমান যখন তার সমস্ত অনুচরগণকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে অশ্বে আরোহণ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে গহন বনের নিস্তব্ধতা ভেদ করে জেগে উঠলো একটা ক্ষীণ অশ্ব-পদ শব্দ।

রহমান তাড়াতাড়ি মাটিতে কান লাগিয়ে শুনল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল– একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, কেউ যেন ঘোড়ায় চড়ে এদিকে ছুটে আসছে। হয়তো শত্রুপক্ষের লোকও হতে পারে। তোমরা সবাই রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাক। শত্রুর আগমনের সংগে সংগেই গুলি ছুড়বে।

রহমান এবং বনহুরের সমস্ত অনুচর গুলিভরা উদ্যত রাইফেল হাতে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ক্রমান্বয়ে অশ্ব-পদ শব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে।

কাছে– আরও কাছে এগিয়ে এলো শব্দটা। রহমান রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। অন্ধকারে তাকিয়ে আছে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হাতে তার উদ্যত রাইফেল।

শেষ রাত্রির জমাট অন্ধকার তখন গোটা বনভূমি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রহমান তার প্রধান অনুচরকে মশাল জ্বালাবার নির্দেশ দিল।

মশাল জ্বালাতেই গাঢ় অন্ধকার বনভূমি কিছুটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মশালের আলোতে চক্‌চক্‌ করে উঠল দস্যুদের হাতের রাইফেলগুলো।

যমদূতের মত এক একজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের শরীরে জমকালো পোশাক। চোখ দিয়ে যেন সবার আগুন টিকরে বের হচ্ছে। তাদের সর্দার আজ বন্দী। হিংস্র বাঘের মত হয়ে উঠেছে এক একজন। রহমানের তো কথাই নেই।

সবাই যখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুণ্‌ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে অশ্বারোহী এগিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচর এবং রহমান আনন্দ ধ্বনি করে উঠল—সর্দার!

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াল।

রহমান খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেল বনহুরের পাশে। বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা নিয়ে চুম্বন করে বললো- জানি সর্দার, আপনাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

বনহুর বললো- রহমান, আমার অনুচরগণের মধ্যে এমন কেউ আছে যার পেটে কথা হজম হয় না। কে সে লোক —আমি তাকে দেখতে চাই।

রহমান বনহুরের কণ্ঠস্বরে শিউরে উঠল। প্রথমে তাকাল সে বনহুরের মুখের দিকে, তারপর দণ্ডায়মান সকল অনুচরের মুখের দিকে।

বনহুর গর্জে উঠল—কে সে, যে সামান্য একটা কথা চেপে রাখতে পারে না। এবার বনহুর তার অনুচরদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকে মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল।

রহমান নিজে মশাল ধরল প্রত্যেকের মুখের কাছে। হঠাৎ বনহুর বলে ওঠে—শয়তান। সঙ্গে সঙ্গে জাফরের চুল ধরে টেনে বের করে আনে।

সবাই অবাক হয়।

বনহুর কিন্তু জাফরের মুখোভাব লক্ষ্য করেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে জাফরের মুখমণ্ডল।

হাতজোড় করে বলে—সর্দার, আমিই বলেছিলাম নূরীর কাছে এবারের মত মাফ করে দেন। মাফ করে দেন সর্দার। মাফ করে........

জাফরের কথা শেষ হয় না। বনহুরের রিভলভারের গুলি তার বক্ষ ভেদ করে চলে যায়।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে জাফর। কিছুক্ষণ ছটফট করে নীরব হয়ে যায় দেহটা।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে— নিয়ে যাও। শিয়াল-কুকুরের মুখে ফেলে দাও।

বনহুর এবার আস্তানার ভিতরে প্রবেশ করে।

পাহারারত দস্যুগণ দু'ধারে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। বনবহুর এগিয়ে যায় নিজের কক্ষের দিকে।

বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ে। হাতের রিভলভারখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয় টেবিলের ওপর। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। আর মনের অস্থিরতা ফুটে ওঠে মুখমণ্ডলে।

বিশ্রামাগারের উজ্জল আলোতে বনহুরকে আজ অদ্ভুত লাগছিল। কখনও পায়চারি করে, কখনও বিছানায় গিয়ে বসে, কখনও মুক্ত জানালার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্রমে পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে আসে।

বনহুরের মনের অস্থিরতা এতটুকু কমে না।

নূরী কিন্তু আড়ালে থেকে সব দেখছিলো। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ভুল সে করেছিল, তার জন্য কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল করে ফেলেছিল। বনহুরকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে নূরী এক বিন্দু পানি পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মনের মধ্যে তার একটা অনুশোচনার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছিল। বনহুর তাকে অবহেলা করতে পারে। পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে পারে, অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারে, তবু নূরী কিছুতেই বনহুরকে ত্যাগ করতে পারে না। বনহুরের স্মৃতি সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

কান্দাইয়ার বন থেকে ফিরে আসার পর সেই যে নূরী শয্যা নিয়েছিল, একটিবারও ওঠেনি বা কিছু খায়নি। দাসী এসে কয়েকবার খাবার জন্য অনুরোধ করছে, কিন্তু নূরী মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল বিছানায়। কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত চোখের পানিও শুকিয়ে গিয়েছিল।

গোটা রাত কখনও নূরী কেঁদেছে, কখনও স্তব্ধ হয়ে মৃতের ন্যায় বিছানায় পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ দাসী এসে যখন জানাল বনহুর ফিরে এসেছে তখন কি যে আনন্দ হয়েছিল নূরীর মনে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছুটে এসেছিল সে বনহুরের পাশে, কিন্তু সম্মুখে আসতে পারেনি। সে—সাহস পায়নি।

আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দেখছিল সে বনহুরকে। খোদার নিকট হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করছিল।

কিন্তু গোটা রাত শেষ হয়ে এলো, বনহুর অস্থিরভাবে কক্ষে পায়চারি করছে, মুখমণ্ডলে তাঁর গভীর উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠেছে। নূরী তখন আর স্থির থাকতে পারল না, এক সময় ছুটে গিয়ে বনহুরের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

বনহুর কঠিন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর এক ঝটকায় পা সরিয়ে নিল।

নূরী পুনরায় দু'হাতে বনহুরের পা চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল– হুর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

বনহুর এবারও কোন কথা বললো না।

নূরীর অশ্রু বনহুরের পা দু'খানার উপর মুক্তাবিন্দুর মত ঝরে পড়তে লাগল।

বনহুর আর দাঁড়াল না, নূরীর হাতের মধ্যে থেকে পা দু'খানাকে টেনে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

নূরী লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে।

পূর্বদিনের সেই স্থানে একটা বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে আছে শিকারী ভদ্রলোক। আজ এখানে দস্যু বনহুর তাকে অশ্ব ফেরত দেবার কথা আছে।

মিঃ হারুন দলবল নিয়ে একটি গোপন স্থানে প্রতীক্ষা করছেন। বনহুরকে আজ তারা গ্রেফতার করবেই।

মিঃ হারুনের সঙ্গে রয়েছেন মিঃ হাকিম এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। সকলেই উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তাকিয়ে আছে এ বৃক্ষের নিচে শিকারী ভদ্রলোকের দিকে।

ক্রমে রাত বেড়ে আসে।

শীতের কনকনে হাওয়া অফিসারদের শরীরে কম্পন ধরায়। প্রত্যেকের শরীরেই ওভারকোট। পায়ে গরম মোজা। হাতে পশমী গ্লাবস। তবুও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন তাঁরা। আজ সন্ধ্যা থেকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। কিছুক্ষণ আগে সামান্য একটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। হিমেল হাওয়া বইছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিজলী চমকাচ্ছে।

এখানে পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন যখন দলবল নিয়ে দস্যু বনহুরের জন্য প্রতীক্ষা করছেন, ঠিক সেই সময়ে মিঃ শঙ্কর রাও-এর দরজায় এক ভদ্রলোক কড়া নাড়লেন।

এত রাতে হঠাৎ কে তাঁকে বিরক্ত করতে এলো! একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজা খুলে বললেন- কাকে চান?

ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—আপনিই কি মিঃ রাও? হ্যাঁ আমিই।

দেখুন, এক্ষুণি আপনাকে ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন যেতে বলেছেন। তিনি ফুলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথে যে বড় আমগাছটি রয়েছে, সেখানে অপেক্ষা করছেন। এই যে চিঠিখানা তিনি আপনাকে দিয়েছেন।

মিঃ শঙ্কর রাও কাগজখানা খুলে পড়লেন, তাতে লেখা রয়েছে- মিঃ রাও, শীঘ্র চলে আসুন, আমি ফুলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথের ধারে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনার জন্য একটি অশ্ব পাঠালাম, দেরী করবেন না যেন, চলে আসুন।

ইতি—
হারুন

শঙ্কর রাও লোকটার মুখে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম কি?

আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, আমার নাম মিঃ নৌশাদ আলী।

ও, আপনি মিঃ নৌশাদ আলী? এতক্ষণ আপনাকে চিনতে পারিনি, মাফ করবেন। আসুন, ভিতরে বসবেন, চলুন।

না, এখন নয়। আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

আচ্ছা, আসছি। শঙ্কর রাও অন্দরবাড়িতে প্রবেশ করেন। একটু পরে গরম জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলেন- চলুন মিঃ নৌশাদ আলী।

চলুন।

শঙ্কর রাওকে একটি অশ্ব দেখিয়ে বললেন নৌশাদ আলী-এই অশ্বে আপনি চলে যান।

আর আপনি?

আমি একটু ফুলবাড়ি থানা হয়ে আসছি। কথাটা শেষ করে অন্য একটি অশ্বে চেপে বসেন নৌশাদ আলী।

এসব রাস্তাঘাট শঙ্কর রাও এর অতি পরিচিত। তিনি ইতোপূর্বে আরও কয়েকবার ফুলবাড়ি গ্রামে গিয়েছিলেন। আজ রাত দুপুরেও পথ চিনতে ভুল হয় না তার।

ঘণ্টা দেড়েক চলার পর ফুলবাড়ি গ্রামের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। তিনি ভালভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাতে লাগলেন।

যদিও আকাশ এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, তবু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বিদ্যুতের আলোতে তিনি দেখতে পেলেন ফুলবাড়ি গ্রামের পথে একটি আমগাছের তলায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ রাও অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিলেন।

ওদিকে মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়ালেন। অশ্ব-পদশব্দ ক্রমান্বয়ে আমগাছতলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলেন মিঃ হারুন—হ্যাঁ, সত্যিই একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে চেপে গাছটার নিচে পৌঁছে গেছে।

কালবিলম্ব না করে মিঃ হারুন হুইসেলে ফুঁ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পুলিশ-ফোর্স আম গাছতলায় হাজির হলো। উদ্যত রাইফেল হাতে ঘেরাও করে ফেলল অশ্বারোহীকে।

মিঃ হারুন রিভলভার উদ্যত করে ধরে বললেন- খবরদার, নড়লেই গুলি ছুঁড়বো।

একি কাণ্ড! শঙ্কর রাও হকচকিয়ে গেলেন। তবু হাত তুলতে বাধ্য হলেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— গ্রেফতার কর।

মিঃ শঙ্কর রাও তখন অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বলে ওঠেন—আমি— আমি শঙ্কর রাও।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। মিঃ হারুন এবং তাঁর দলবল বিস্ময়ে 'থ' মেরে যায়—এ যে মিঃ শঙ্কর রাও। প্রথমে কারও মুখে কথা সরে না, একটু পরে মিঃ হারুন বলে ওঠেন—আপনি কেন?

শঙ্কর রাও কেমন যেন হাবা বনে গিয়েছিলেন, ঢোক গিলে বললেন- আপনি আমাকে ডেকে পাঠাননি?

আমি! না তো। কে বল্লল এ কথা আপনাকে?

কেন, মিঃ নৌশাদ আলী গিয়েছিলেন। আপনার চিঠিও নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

মিঃ হারুন গম্ভীর হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন দস্যু বনহুরেরই এই কাণ্ড।

শিকারী ভদ্রলোক এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এসব দেখছিল। যা হোক, তার অশ্বটা যে ফেরত পেয়েছে এই যথেষ্ট।

মিঃ হারুন যেন বেকুব বনে যান। এমন অপদস্থ তিনি আর কোনদিন হননি। দস্যু বনহুরের ওপর তাঁর রাগ চরমে ওঠে।

অধর দংশন করেন তিনি।

এমন সময় একটা হাসির শব্দ ভেসে আসে—হাঃ হাঃ হাঃ। অদ্ভুত সে হাসির শব্দ। পুলিশবাহিনী এবং অফিসারগণ অবাক হয়ে যায়। মিঃ হারুন পুলিশ ফোর্সকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। নিজেও ছুটে যান যেদিক থেকে হাসির শব্দটা এসেছিল, সেই দিকে।

বারবার মিঃ হারুনের রিভলভার গর্জে উঠতে লাগল– গুড়ুম গুড়ুম---

কিন্তু অনেক সন্ধান করেও দস্যু বনহুরের পাত্তা মিলল না। এক সময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে চললেন মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে।

শিকারী তার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নিজ বাড়ির দিকে রওনা দিল। তার অতি আদরের অশ্বটিকে ফেরত পেয়ে খুশিতে ভুলে গেলো সব। ভুলে গেছে দস্যু বনহুরের গতকালের কথাগুলো।

অশ্ব নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সে।

ফুলবাড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে একটি প্রান্তর, তারপরই শহরের বড় রাস্তা পড়বে। শিকারী প্রান্তরের মাঝখানে এসে পৌঁছল। হঠাৎ তার সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়ালো এক অশ্বারোহী।

মুহূর্তে শিকারীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করল–কে?

সম্মুখস্থ অশ্বারোহী চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলো— দস্যু বনহুর।

শিউরে উঠল শিকারী। কানের কাছে প্রতিধ্বনি হলো গতকালের দস্যু বনহুরের কথাগুলো— কোন চালাকি করতে গেলে মরবে। আমি তোমার ক্ষমা করব না। কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠলো ওর। ভীতকণ্ঠে বলে ওঠে– আপনি ...... আপনি........

হ্যাঁ। এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। জান– দস্যু বনহুর কোনদিন অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করে না।

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে শিকারীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। দু'চোখে সর্ষে ফুল ভেসে ওঠে। কিছু বলতে যায় সে, কিন্তু তার পূর্বেই বনহুরের রিভলভার গর্জে ওঠে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যায় শিকারী।

বনহুর একবার মাত্র ফিরে তাকায়, তারপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

❑

আসুন, আসুন, ডাক্তার বাবু। জমিদার ব্রজবিহারী রায় ডাক্তারকে সর্দার সম্ভাষণ জানালেন।

ডাক্তার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ আপনার কন্যা কেমন আছে রায় বাবু?

আগের চেয়ে সুভা এখন কিছুটা ভাল। চলুন, ওকে দেখবেন চলুন।

চলুন। ডাক্তার ব্রজবিহারী রায়কে অনুসরণ করলেন।

ব্রজবিহারী রায়ের মনে এখন অনেকটা শান্তি ফিরে এসেছে। এই ডাক্তারের প্রচেষ্টাতেই সুভাষিণী আজ আরোগ্যের পথে। কাজেই ডাক্তারকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করেন। তাছাড়া এ ডাক্তার সম্বন্ধে রায়বাবু গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন,—অন্যান্য ডাক্তারের চেয়ে ইনি কেমন যেন স্বতন্ত্র। টাকার লোভী যে ইনি নন, তাও বুঝতে পেরেছিলেন। এতদিন যত ডাক্তারই এসেছেন সুভাষিণীর চিকিৎসার জন্য প্রথমেই তাঁরা টাকার প্রশ্ন তুলেছেন। সবাই যেন টাকার জন্য তাঁর কন্যার চিকিৎসা করতে এসেছেন। শুধু একটি মাত্র ডাক্তার, যিনি এখনও টাকার কোন প্রশ্ন তোলেননি।

ডাক্তার প্রথম দিন দেখে যাবার পর কয়েক দিন আর আসেননি। ব্রজবিহারী রায় ভেবেছেন, এ ডাক্তারও চলে গেলেন—আর আসবেন না। কিন্তু হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন। সুভাকে দেখলেন, ঔষধপত্র দিলেন। তারপর মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন। সুভাষিণীকে দেখেন, ঔষধপত্র দিয়ে যান।

সুভাষিণীর দিকে তাকিয়ে ব্রজবিহারী রায় অনেকটা সান্ত্বনা খুঁজে পান। সুভাষিণীর মা জ্যোতির্মিয়ী দেবীর মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ ফিরে এসেছে। যদিও সুভাষিণী এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেনি, তবু আগের চেয়ে এখন কিছু ভাল। খাবার দিলে খায়। স্নানের সময় আপন মনে মাথায় জল ঢালে। কাপড় পরে, চুল আঁচড়ে দিলে চুপ করে থাকে। কিন্তু এখনও সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। এমন কি বৌদি চন্দ্রাদেবীর সঙ্গেও না।

ডাক্তার এলে সুভাষিণীর মধ্যে যেন একটু পরিবর্তন দেখা যায়। চোখ দুটো ওর উজ্জ্বল দীপ্তময় হয়ে ওঠে। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে সে ডাক্তারের গভীর দু'টি নীল চোখের দিকে।

ডাক্তারকে নিয়ে ব্রজবিহারী রায় কন্যার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

চন্দ্রাদেবী তখন সুভাষিণীর চুল বেঁধে দিচ্ছিল। শ্বশুরের সঙ্গে ডাক্তারকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে মাথার কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল চন্দ্রাদেবী। সুভাষিণীর চুল বাঁধা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সুভাষিণী নতমুখে যেমন বসেছিল—তেমনি রইলো। চোখ তুলে চাইলো না সে।

ব্রজবিহারী রায় কন্যাকে সম্বোধন করে বলেন—মা সুভা, দেখ ডাক্তার বাবু এসেছেন।

সুভাষিণী ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল।

ডাক্তার তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তিনি এবার সুভার পাশের আসনে বসে বললেন—দেখি আপনার হাতখানা।

সুভাষিণী হাতখানা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

ডাক্তার হেসে বললেন—আগের চেয়ে অনেক ভাল মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, এর জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

একটু থেমে পুনরায় বললেন ব্রজবিহারী রায়—কিন্তু আমি বড়ই দুঃখিত যে, আজও আপনি একটি পয়সাও গ্রহণ করলেন না।

সেজন্য দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই রায় বাবু। আপনার কন্যা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেনি এখনও।

ব্রজবিহারী রায় পুত্রবধূকে লক্ষ্য করে বললেন— বৌমা, ডাক্তার বাবুর জন্য একটু জলখাবার তৈরি করে নিয়ে এসো।

চন্দ্রাদেবী হেসে বলল—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

চন্দ্রাদেবী বেরিয়ে গেল। ব্রজবিহারী রায় পুত্রবধূর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যি ডাক্তারবাবু, কি বলব, বৌমা না থাকলে সুভা-মাকে আমরা কেউ খাওয়াতে পারতাম না। এমন কি ওর মায়ের হাতেও সে খায় না। এখন সুভা আমার স্নান করে। খাবার নিজ হাতে তুলে খায়। আপন মনে বলে চলেছেন রায়বাবু।

সুভাষিণী কিন্তু তখনও তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের চোখের দিকে, ডাক্তারও স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সুভাষিণীর দিকে। ডাক্তারের দৃষ্টির মধ্যে সে যেন খুঁজে পেয়েছে তার না পাওয়ার বস্তুটির সন্ধান।

উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। চন্দ্রাদেবী কখন যে সকলের অলক্ষ্যে কক্ষে প্রবেশ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তা কেউ খেয়াল করেনি। একটু কেশে বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী—এই যে জলখাবার এনেছি।

চন্দ্রাদেবীর কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে আসে ডাক্তারের। তিনি তাকান চন্দ্রাদেবীর দিকে।

ব্রজবিহারী রায় তখনও বলে চলেছেন—বৌমার গুণ আর কত বলব ডাক্তার বাবু। এমন মেয়ে আর হয় না। এই দেখুন, এতগুলো জলখাবার কত অল্প সময়ে তৈরি করে আনল।

চন্দ্রাদেবীর মনে কিন্তু তখন একটা চিন্তাস্রোত বয়ে চলেছে। শুধু আজ নয়, আরও কয়েক দিন সে লক্ষ্য করেছে—সুভা আর ডাক্তার নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে উভয়ে উভয়ের দিকে।

আজ চন্দ্রাদেবীর মনে প্রশ্নটা ধাক্কা মারে। সে শুধু বুদ্ধিমতী নারী নয়–শিক্ষিতাও। ভাবে, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন একটা কিছু রয়েছে। তাছাড়া সবাই ডাক্তারকে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করলেও চন্দ্রাদেবী কোনদিন এই ডাক্তারটিকে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করতে পারেনি। কেন যেন ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও সঙ্কোচিত হয়ে পড়ত সে। ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারতো না চন্দ্রাদেবী। দৃষ্টি নত করে নিতে বাধ্য হত কিন্তু কেন যে কথা বলতে পারত না সে নিজেই জানে না।

সেদিন ডাক্তার সুভাষিণীর জন্য নতুন ঔষধপত্র দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ব্রজবিহারী রায় অন্যান্য দিনের মতো আজও ডাক্তারকে বিদায় দেবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

চন্দ্রাদেবী বলে ওঠেন— বাবা, আপনি সুভার পাশে বসুন, আমার একটু কাজ আছে।

অগত্যা ডাক্তার বাবুকে সেখান থেকেই বিদায় দিয়ে কন্যার পাশে গিয়ে বসলেন ব্রজবিহারী রায়।

জমিদার বাড়ি— অনেকগুলো গেট পেরিয়ে তবেই হলঘরের দরজায় পৌঁছান যায়। তারপর বাইরে বের হবার পথ। ডাক্তার পরপর কয়েকটা

গেট পেরিয়ে হলঘরের বারান্দায় পৌঁছলেন। তারপর যেমনি তিনি বড় গেটের দিকে পা বাড়াবেন অমনি একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চন্দ্রাদেবী, পেছন থেকে ডাকল—ডাক্তার বাবু।

থমকে দাড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার। বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন। ততক্ষণ চন্দ্রাদেবী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পূর্বে এত কাছে কোনদিন সে আসেনি।

ডাক্তার কিছু জিজ্ঞাসা করার পূবেই বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী—ডাক্তার বাবু, আপনি কে?

ডাক্তারের মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে ওঠে, বলে—সন্দেহ হচ্ছে?

হ্যাঁ। আপনি ডাক্তার নন।

কেন, আপনার ননদিনী কি আরোগ্য লাভ করছে না?

তা জানি না, কিন্তু আপনি যে ডাক্তার নন, এ আমি জানি। বলুন আপনি কে?

ডাক্তার কিছু ভেবে বললেন—চন্দ্রাদেবী, সত্যিই আমি ডাক্তার নই। কিন্তু.....

কিন্তু নয়, আপনি আমার নিকট লুকাতে চেষ্টা করবেন না, আপনার আসল পরিচয় আমি জানতে পেরেছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আপনি–আপনি----

বলুন, বলুন?

আপনি দস্যু বনহুর।

ধন্যবাদ। আপনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন সেজন্য আমি কিছু মাত্র আশ্চর্য হইনি।

জানেন, আমি এখনি আপনাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারি।

সে জন্য আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। বরং আপনার ননদের চিকিৎসার হাত থেকে উদ্ধার পেতাম। চন্দ্রাদেবী, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি গোপনীয় কথা আছে! যদি মনে কিছু না করেন···

চন্দ্রাদেবী গম্ভীর কণ্ঠে বলে—দস্যু বলে আমি আপনাকে ভয় করি না। যদি বলার মত কথা হয় বলতে পারেন।

নিজ মনেই হাসে বনহুর। যে দস্যুর নাম স্মরণে শহরবাসীর হৃদকম্প শুরু হয়—সেই দস্যুর সামনে দাঁড়িয়ে একটি নারী এতবড় কথা বলতে পারে

না। চন্দ্রাদেবীর সাহসের পরিচয় পেয়ে খুশি হলো সে, চারদিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল—দেখুন,. সুভাষিণীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে হলে আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।

বলুন আমি কি করতে পারি?

মাধবগঞ্জের জমিদারপুত্র মধুসূদনের সঙ্গে সুভাষিণীর বিয়ে হবে, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সহায়তা করবেন।

রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী–সুভা যে আপনাকে ভালবাসে।

সে কথায় কান না দিয়ে বলে ওঠে ডাক্তারবেশী দস্যু বনহুর—চন্দ্রাদেবী, সুভা যে ডাক্তারকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছে এটা হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন।

হ্যাঁ করেছি। কিন্তু সে ডাক্তারকে ভালবাসেনি, ভালবেসেছে তাঁর দু'টি চোখকে।

চন্দ্রাদেবী!

হ্যাঁ, দস্যু হলেও আপনি মানুষ। সবাই আপনাকে না বুঝলেও আমি জানি আপনার হৃদয় অতি মহৎ। আপনি আমার ছোট বোনের মত আদরের সুভাকে বাঁচান, বাঁচান–

উদ্বিগ্ন হবেন না চন্দ্রাদেবী। আমি যা বলব সেভাবে আপনাকে কাজ করতে হবে।

বলুন কি করতে হবে?

তেমন কোন কঠিন কাজ নয় চন্দ্রাদেবী। আমি এরপর মধুসেনকে সঙ্গে আনবো।

মধুসেন—সুভার-ভাবী স্বামী মধুসেন?

হ্যাঁ, তাকেই আমি ডাক্তার বেশে আনব। চন্দ্রাদেবী, আপনি ডাক্তার আর সুভাষিণীর দৈনন্দিন নিবিড় প্রেমে সাধ্যমত সাহায্য করবেন।

কিন্তু......

না, আর কিন্তু নয়। মনে রাখবেন চন্দ্রাদেবী, একথা আপনি ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে। যখন দেখবেন উভয়ের মধ্যে একটা গভীর বন্ধনের সৃষ্টি গড়ে উঠেছে তখন ডাক্তারের মুখোশ উন্মোচিত করে ফেলবেন --বাস, তারপর আপনাকে কিছু করতে হবে না।

এ কি করে সম্ভব হবে?

অসম্ভব কিছুই নয় চন্দ্রাদেবী। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি?

চন্দ্রাদেবী কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বে বনহুর বাইরে বেরিয়ে গেছে।

সুভাষিণীর কক্ষে ফিরে আসে চন্দ্রাদেবী। দেখতে পায় রায়বাবু বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। পুত্রবধূর আগমনে তিনি উঠে দাঁড়ান—আমার এখন তাহলে ছুটি?

হ্যাঁ বাবা, আপনি যান! আমি বসছি।

ব্রজবিহারী রায় বেরিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীর পাশে বসে। তখনও তার মনে চিন্তার রেখাজাল জট পাকাচ্ছিল। দস্যু বনহুর স্বয়ং তাদের বাড়িতে আসে— যায় অথচ তারা কেউ জানে না সে কথা। নিভৃতে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠে চন্দ্রাদেবী। এ দাঁড়ি গোফের অন্তরালে না জানি কেমন একখানা মুখ লুকানো আছে—যে মুখখানার জন্য আজ সুভার এই অবস্থা। চন্দ্রাদেবীর মনে দস্যু বনহুরের আসল রূপ দেখার বাসনা জাগে।

❑

মিঃ হারুন অফিসে প্রবেশ করতেই সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ জাহেদ বলেন–স্যার, কালকের সেই শিকারী খুন হয়েছে।

বলেন কি! আঁতকে ওঠেন মিঃ হারুন।

হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে গিয়েছিলাম, পরীক্ষা করে দেখে এলাম। কালকেই সেই শিকারী ভদ্রলোককে কে বা কারা গুলি করে হত্যা করেছে।

ইস! নিশ্চয় এ দস্যু বনহুরের কাজ।

হ্যাঁ স্যার, আমারও তাই মনে হয়।

লাশ কি মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন?

না স্যার, আপনাকে জিজ্ঞেস না করে আমি কিছুই করিনি। বেশ করেছেন। আমি লাশটা একবার পরীক্ষা করে দেখব। তাহলে আমি গাড়ি বের করতে বলি স্যার?

না, আমার গাড়িতেই যাব। আপনিও চলুন মিঃ জাহেদ।

মিঃ হারুনের গাড়ি বাইরেই অপেক্ষা করছিল। মিঃ হারুন— মিঃ জাহেদ এবং দু'জন পুলিশকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন।

গন্তব্যস্থানে পৌছে মিঃ হারুন দেখলেন, শিকারীর রক্তাক্ত দেহ একটা প্রান্তরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। খানিকটা জায়গা রক্তে জমাট বেঁধে আছে।

হঠাৎ মিঃ হারুনের নজরে পড়ল, লাশটার পাশে একটি কাগজের টুকরো পড়ে আছে। মিঃ হারুন কাগজের টুকরোখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে পড়লেন, "বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি এমনি করেই হয়।" –দস্যু বনহুর

মিঃ হারুন রাগে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন, বজ্রকঠিন স্বরে বললেন–দিন দিন দস্যু বনহুরের ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌছে যাচ্ছে। অচিরে তাঁকে পাকড়াও করতে না পারলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না।

লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে অফিসে ফিরে এলেন মিঃ হারুন এবং তার সঙ্গিগণ। এবার মিঃ হারুন পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য রওয়ানা দিলেন।

মিঃ আহমদের সঙ্গে মিঃ হারুনের অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল। শঙ্কর রায়কেও ডাকা হলো সেখানে। তিনিও এ ব্যাপারে কাজে নেমে পড়বেন কথা দিলেন।

আবার পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো।

এবার বিদেশ থেকে একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার এলেন দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে। ইতোপূর্বে তিনি কয়েকজন ভয়ংকর দস্যুকে গ্রেফতার করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। পুলিশ অফিসারটির নাম মিঃ জাফরী। যেমনি দুঃসাহসী তেমনি দুর্দান্ত। তাঁর মত জোয়ান এবং বলিষ্ঠ পুলিশ অফিসার কমই নজরে পড়ে।

দস্যু ভোলানাথকে গ্রেফতার করতে গিয়ে মিঃ জাফরীর চোয়ালে ভয়ংকর একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষত শুকিয়ে গেছে কিন্তু এখনও সেখানে একটা গভীর দাগ কাটা রয়েছে। সে দাগটা মিঃ জাফরীর চেহারাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

মিঃ জাফরী এসে পৌছতেই সমস্ত পুলিশ অফিসার তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। এমনি কি পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ পর্যন্ত মিঃ জাফরীকে স্বাগত জানাতে এলেন।

শহরের বিশিষ্ট ডাক বাংলোয় মিঃ জাফরীর থাকার ব্যবস্থা করা হল। মিঃ জাফরীর সঙ্গে একদল পুলিশ ফোর্সও এসেছিল। তারা বাংলোর পেছনে তাঁবু ফেলল।

ডাক বাংলোতেই মিঃ আহমদের সঙ্গে জাফরীর বৈঠক বসল। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত পুলিশ অফিসার এবং শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। মিঃ শঙ্কর রাও তার বাল্যবন্ধু ক্যাপ্টেন মিঃ আলমকে নিয়ে এসেছিলেন। সম্প্রতি মিঃ আলম লন্ডন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি এখন সুদক্ষ গোয়েন্দা।

এ বৈঠকে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হল।

শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের মধ্যে ধনী ব্যবসায়ী জনাব হারেস উদ্দিনও ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন ঐশ্বর্যশালী, ধনবান। কিন্তু তার মন ছিল নিতান্ত ছোট। টাকা পয়সাকে তিনি নিজ সন্তানের চেয়েও বেশি দরদ করতেন। কাজেই দস্যু বনহুরকে তাঁর ভয় ছিল বেশি।

দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তিনি মিঃ জাফরীকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। বনহুরকে নিয়ে নানা রকমের কুৎসা গড়ে শোনালেন। এমন কি চৌধুরী সাহেবের কন্যা মনিরাকে দস্যু বনহুর চুরি করে নিয়ে গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল এ কথাও জানালেন।

মিঃ জাফরী অবশ্য জনাব হারেসের কথায় খুশি হতে পারছিলেন না। কারণ দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তার যা জানার প্রয়োজন তিনি পুলিশ ডায়েরী থেকেই জেনে নিয়েছেন এবং আরও নেবেন।

জনাব হারেস তবু থামলেন না। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে জানালেন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে আমিও আপনাদের সহায়তা করব। ছলে-বলে-কৌশলে–যে প্রকারেই হোক তাকে বন্দী করা প্রয়োজন।

জনাব হারেসউদ্দিনের পাশেই বসেছিলেন মিঃ আলম। এতক্ষণ তিনি নীরবে সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবার হেসে বললেন—দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য আপনার উৎসাহ সত্যি প্রশংসনীয়। আপনার সহায়তা পেলে মিঃ জাফরী নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

মিঃ আলমের কথায় মিঃ জাফরী তাকালেন তাঁর দিকে। মিঃ আলমের শরীরে সাহেবী পোশাক পরিচ্ছদ। মাথায় আমেরিকান ক্যাপ। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। চোখমুখ উজ্জ্বল দীপ্তময়! কণ্ঠস্বর গম্ভীর শান্ত সুমিষ্ট। মিঃ জাফরী আলমের কথায় খুশি হলেন।

সেদিন বৈঠকে আর বেশিদূর এগোয় না। সবাই বিদায় গ্রহণ করেন।

শুধু থেকে যান মিঃ আহমদ, মিঃ হারুন, শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম। তাঁরা এবার ডাকবাংলোর ভিতরে একটি সুসজ্জিত গোপন কক্ষে গিয়ে বসলেন। সকলের সম্মুখে তো গোপন আলোচনা চলে না, এবার শুরু হল তাদের মধ্যে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের গোপন পরামর্শ।

ইতোমধ্যে শঙ্কর রাও মিঃ আলমের সঙ্গে মিঃ আহমদ, মিঃ হারুন এবং মিঃ জাফরীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ আলমের ব্যবহারে এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় যথেষ্ট খুশি হলেন মিঃ জাফরী। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে মিঃ আলমের মত একজনকে পাশে পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন জানালেন।

মৃদু হেসে মিঃ আলম জানালেন–যতদূর সম্ভব তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

এক সময় সবাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

বনহুরের মোটর এসে থামলো নাইট ক্লাবের সম্মুখে। বনহুরের শরীরে দামী স্যুট। গাড়ি থেকে নেমে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো সে— তারপর এগুলো ক্লাবের দরজার দিকে।

ক্লাবে প্রবেশ করতেই একটা যুবতী তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল–হ্যালো মিঃ প্রিন্স!

বনহুর হাস্যোজ্জ্বলমুখে যুবতীকে অভ্যর্থনা জানাল–হ্যালো মিস ডালিয়া, ভালো তো?

ডালিয়া বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা দু'হাতে চেপে ধরল–খুব ভাল।

আর তুমি।

ভাল না।

কেন?

রাজ্য নিয়ে যে তোলপাড় শুরু হয়েছে!

তাই বুঝি আর তোমার সাক্ষাত পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ ডালিয়া।

বনহুর যুবতীর কথায় জবাব দিতে দিতে তাকায় ক্লাবের ভিতরের চারদিকে। এগুতে থাকে সে। ডালিয়া চলে তাঁর সঙ্গে।

এক কোণে গিয়ে বসে বনহুর।

ডালিয়াও বসে তার পাশের চেয়ারে।

বয় এসে সম্মুখে দাঁড়াতেই বনহুর বলে—শুধু দু'কাপ কফি।

কেন, আর কিছু খাবে না?

না।

আজ তোমাকে বড্ড ভাবাপন্ন লাগছে প্রিন্স।

বনহুর পুনরায় আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একরাশ ধোয়া ছুড়ে দেয় সম্মুখে।

ধুম্রকুণ্ডলি হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে ডালিয়া—কই, কথা বলছ না যে?

বনহুরের দৃষ্টি তখন ক্লাব কক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় ওপাশের ভেলভেটের ভারী পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে একটি যুবক আর একটা যুবতী। কি যেন কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল দু'জনে।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে। হস্তস্থিত সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়াল।

ডালিয়া হেসে বলে—কি হল, উঠে পড়লে যে?

বনহুর ডালিয়ার কথায় কোন জবাব না দিয়ে এগুতে থাকে। সম্মুখস্থ যুবক-যুবতী তখন ক্লাবের দরজার দিকে এগিয়ে গেছে।

ক্লাবের গেটে এসে যুবতী দাঁড়িয়ে পড়ে। যুবক যুবতীর হাতে হাত রেখে বিদায় গ্রহণ করে।

ক্লাবের সম্মুখে থেমে থাকা একটি গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দেয় যুবক। যুবতী হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। তারপর ফিরে যায় ক্লাব কক্ষের ভেতরে।

বনহুর কালবিলম্ব না করে নিজের গাড়িতে চেপে বসে। সম্মুখের গাড়িখানা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

বনহুর নিজের গাড়ি নিয়ে সম্মুখের গাড়িখানাকে ধাওয়া করে। এ পথ সে পথ দিয়ে আগের গাড়িখানা এগিয়ে চলেছে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে গাড়ি চালাচ্ছে বনহুর।

একটা সরু গলির মধ্যে সম্মুখস্থ গাড়িখানা প্রবেশ করতেই বনহুর নিজের গাড়িখানাও সেই গলি পথে নিয়ে গেল এবং স্পীড বাড়িয়ে দিল।

একে সরু গলি তদুপরি পথের দু'ধারে ড্রেন, কাজেই সম্মুখস্থ গাড়িখানার গতি অনেক কমে এসেছিল।

বনহুর অতি অল্প সময়ে সম্মুখস্থ গাড়ির নিকটে পৌঁছে যায়। একেবারে নির্জন রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে শব্দহীন রিভলবারখানা বের করে সম্মুখের গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাড়িখানা থেমে যায়।

বনহুর রিভলভার হাতে নেমে পড়ে। এক লাফে সম্মুখের গাড়িখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মাথার ক্যাপটা সামনে আরও কিছুটা টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে—শিগগির নেমে এসো।

যুবক ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় বনহুরের দিকে। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে–তুমি কে?

আমি যেই হই—যদি বাঁচতে চাও— নেমে এসো।

অগত্যা যুবক গাড়ির দরজা খুলে নেমে আসে।

বনহুর যুবকের বুকে রিভলভার চেপে ধরে বলে—পেছনের গাড়িতে উঠে বস।

জনহীন গলিপথে রিভলভারের মুখে দাঁড়িয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। নিঃশব্দে পিছনের গাড়িতে উঠে বসল।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়। পেছনে চালিয়ে গাড়িখানা বড় রাস্তায় বের করে আনে। বড় রাস্তাও তখন জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

বনহুর যুবককে নিয়ে অতি দ্রুত গাড়িখানাকে অন্য একটা নির্জন পথে চালনা করে। কিছুক্ষণ চলার পর একটা বাড়ির সামনে এসে বনহুর গাড়ি রাখে। নিজে নেমে দরজা খুলে ধরল।

যন্ত্রচালিতের ন্যায় নেমে পড়ে যুবক। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। নীরবে বনহুরকে অনুসরণ করে সে।

প্রকাণ্ড বাড়ি, কিন্তু কোথাও আলো নেই।

বনহুর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বনহুর দরজায় পা রাখতেই একটা নীলাভ আলো পথটাকে উজ্জ্বল করে তুলল।

বনহুর যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। লোকটি দরজা বন্ধ করে কোথায় অদৃশ্য হলো যুবক বুঝতেই পারল না, বরং মনে মনে আরও ভীত হল সে।

যুবক যে একেবারে দুর্বল তা নয়। সে এত সহজেই গোবেচারার মত এখানে চলে আসত না, কিন্তু ঐ রিভলভারখানাকে তার যত ভয়। আজকাল

প্রায়ই হত্যা চলছে। পথে-ঘাটে-মাঠে শুধু হত্যাকাণ্ড। সেদিনের শিকারী হত্যা কাহিনীও সে কাগজে পড়েছে। ভয়ে শিউরে উঠেছিল– সেও তো রাত বিরাত বাইরে থেকে ফেরে। হঠাৎ যদি তার অবস্থাও কোনো দিন তেমন হয়। তার চিন্তা আজ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তাই সে কোন কথা বলতে সাহসী হয়নি– ভেবেছে, দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে।

বনহুর এগিয়ে চলেছে।

বনহুর একটা বড় ধরনের কক্ষে প্রবেশ করল।

যুবকটা বনহুরের পেছনে পেছনে ঐ কক্ষে ঢুকল।

কক্ষটি আবছা অন্ধকার। জিরো পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। বাল্বের ওপর পুরু ধরনের একটি আবরণ রয়েছে। যাতে আলো বাইরে না যায়, সে জন্যে এই আবরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বুঝতে পারে যুবক।

যুবক এতক্ষণে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। এবার কিছুটা সাহস হল তার, জিজ্ঞাসা করল— তুমি কে? আমার কাছে কি চাও?

বনহুর পায়চারী করছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বলে—আমি দস্যু বনহুর।

যুবক চমকে ওঠে।

বনহুর হেসে বলে—আমি তোমাকে হত্যা করতে আনিনি।

তবে কি টাকা চাও?

না।

তবে কি চাও আমার কাছে?

আমি চাই তোমার জীবন।

জীবন!

হ্যাঁ।

এই তো বললে তুমি আমাকে হত্যা করবে না।

দস্যু বনহুর কোন দিন বিনা কারণে কাউকে হত্যা করে না মধুসেন।

দস্যুর মুখে তার নিজের নাম শুনে আশ্চর্য হয় মধুসেন।

বনহুর বুঝতে পারে, হেসে বলে—শুধু তোমার কেন, তোমার ভাবী স্ত্রী সুভাষিণীর নামও আমার অজানা নেই। এসো, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

বনহুর এবার দেয়ালের গায়ে লাগান একটা সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে এলো সেখানে। বনহুর বলল –চল। নিজেও প্রবেশ করল ঐ দরজা দিয়ে ভেতরে।

এবার মধুসেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হল– কক্ষটি উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত। সেই কক্ষের তীব্র আলোতে মধুসেন স্পষ্ট দেখতে পেল বনহুরকে। চমকে উঠল, এ সেই লোক, যে তাকে একদিন ক্লাবকক্ষে গুণ্ডাদের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। দস্যু বনহুর তাহলে শুধু দুর্দান্তই নয়- মহৎও বটে। মধুসেনের ভয় আরও কমে আসে। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এখানে আনেনি। মধুসেন অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে বনহুরকে। যাকে সে কোনদিন দেখবে বলে আশা করেনি, সেই দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

দস্যু বনহুর মাথার ক্যাপটা খুলে টেবিলে রাখল।

মধুসেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এত সুন্দর দস্যু বনহুর, কল্পনাও করতে পারেনি মধুসেন।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল– সুভাষিণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে কোন অমত আছে?

মধুসেন বিস্ময়ভরা নয়ন তুলে তাকাল। স্থিরকণ্ঠে বললো– না। তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে আমার কোন অমত নেই।

বেশ।

কিন্তু সুভাষিণী আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে যদি রাজী না হয়? তাছাড়া সে তো এ বিয়েতে----

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না মধুসেন। তোমাকে যা বলব– সেভাবেই কাজ করবে।

আগ্রহভরা গলায় বলে ওঠে মধুসেন—সুভাষিণীকে আমি স্ত্রীরূপে পাব।

চেষ্টা করলেই পাবে, আমি যা বলি শোনো। বনহুর এবার মধুসেনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজেও বসে পড়ে তার পাশের চেয়ারে।

কি করতে হবে তা বেশ করে বুঝিয়ে দেয় সে মধুসেনকে। বনহুর মধুসেনকে নিয়ে যখন গাড়িতে চেপে বসে, তখন দিনের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোটা রাত সে মধুসেনকে খুব করে শিখিয়ে তৈরি করে নিয়েছে। মধুসেনের শরীরে ডাক্তারের ড্রেস। বনহুর নিপুণ হাতে তাকে ডাক্তারের পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছে।

এখন কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না সে পূর্বের ঐ ডাক্তার নয়। পার্থক্যের মধ্যে শুধু ডাক্তারের চোখে আজ গগল্‌স্ রয়েছে।

প্রতিদিনের মত ব্রজবিহারী রায় আজও ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ডাক্তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকভাবে ব্রজবিহারীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করে বললেন—সুভাষিণী কেমন আছে রায়বাবু?

আগের চেয়ে এখন অনেকটা ভালই বলে মনে হচ্ছে ডাক্তার বাবু। কিন্তু আপনার গলার স্বর যেন একটু কেমন শোনাচ্ছে।

একটু কেশে বললেন ডাক্তার—গতরাতে ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গলাটা বসে গেছে। চোখ দুটোও কেমন টন টন করছে -------

ও, তাই বুঝি গগল্স্ পরেছেন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আপনি এবার সুভার কক্ষে যান। বৌমা সেখানে আছে।

এবার ডাক্তার বিপদে পড়লেন। এই যা সেরেছে। সুভাষিণীর কক্ষ তো তার জানা নেই। একটু ভেবে বললেন- রায়বাবু, আপনিও চলুন।

আচ্ছা চলুন। সত্যি ডাক্তার বাবু, এখনও আপনার সঙ্কোচ কাটল না? ধরতে গেলে এটা তো আপনার নিজের বাড়ির মত হয়ে গেছে।

ডাক্তার এ কথায় শুধু হাসলেন।

সুভাষিণীয় কক্ষে প্রবেশ করে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। রায় বাবু বলে ওঠেন—থামলেন কেন? আসুন।

সুভাষিণীর পাশে বসে ছিল চন্দ্রাদেবী। শ্বশুরের কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকায়। প্রথমে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে ওঠে। হঠাৎ আজ তার চোখে গগল্স্ কেন? পরক্ষণেই মনে পড়ে দস্যু বনহুরের কথাগুলো---চন্দ্রাদেবী এরপর আমি আর আসব না। আসবে আপনাদের ভাবী জামাতা মধুসেন। আপনি ওদের দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় প্রেমের আবেষ্টনী গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন------

চন্দ্রাদেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ডাক্তারের মুখের দিকে। চিনবার কোন উপায় নেই। কিন্তু চন্দ্রাদেবীর মনের মধ্যে একটা কাঁটার আঘাত যেন খচ খচ্ করে উঠল। এতদিন যার সান্নিধ্যে সুভাষিণী আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে এ সে নয়। তার স্থানে আজ অন্য একজন।

চন্দ্রাদেবীকে ভাবাপন্ন দেখে বলে ওঠেন ব্রজবিহারী রায়—বৌমা ডাক্তার বাবুকে বসতে দাও।

আসুন ডাক্তার বাবু। তারপর ব্রজবিহারী রায়কে লক্ষ্য করে বলে চন্দ্রাদেবী—বাবা, আপনি যান, আমি ডাক্তার বাবুকে সব বলছি।

বেশ মা, বেশ। যাই দেখি সরকার আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে একবার শহরে পাঠাব। ব্রজবিহারী রায় বেরিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী জানে, এ নতুন লোক। কাজেই সে তাকে সাহায্য করে। একটু হেসে বলে— আসুন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার এগিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী তাকে সুভাষিণীর পাশের চেয়ারে বসতে ইংগিত করে বলে— সুভাকে দেখুন ডাক্তার বাবু। গত ক'দিনের চেয়ে এখন সে অনেক ভাল। তারপর সুভাষিণীকে লক্ষ্য করে বলে.. সুভা, দেখো ডাক্তার বাবু এসেছেন।

ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল সুভাষিণী।

ডাক্তার তাকাল সুভাষিণীর দিকে। আজ চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখের অন্তরালে ডাক্তারের চোখ দুটোই ছিলো তার সম্বল। আজ সেই চোখ দুটো ঢাকা পড়েছে কালো চশমার আড়ালে। সুভাষিণীর মুখমণ্ডল বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

চন্দ্রাদেবী বলে– ডাক্তারবাবু, আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য একটু জলখাবার তৈরি করে নিয়ে আসি। কথা শেষ করেই বেরিয়ে যায় সে।

বেশ কিছুক্ষণ ডাক্তার থ'মেরে বসে থাকেন।

সুভাষিণী তাকিয়ে আছে তখনও ডাক্তারের কালো চশমায় ঢাকা চোখ দুটোর দিকে।

হঠাৎ ডাক্তার সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে বলে ওঠে— সুভা, অমন করে কি দেখছো!

সুভাষিণীর ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে। কি বলতে গিয়ে থেমে যায় সে।

ডাক্তার পুনরায় বলে—বল, বল সুভা!

তোমার কালো চশমা খুলে ফেল ডাক্তার। স্তব্ধ কণ্ঠে কথাটা বলে ওঠে সুভাষিণী।

চোখ দুটো বড্ড জ্বালা করছে। তুমি কি চাও আমার দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাক।

না।

সুভা! আবেদন মাখা কণ্ঠস্বর ডাক্তারের।

এরপর হতে ডাক্তার রোজ আসে।

চন্দ্রাদেবীও ডাক্তারকে সুভাষিণীর পাশে বসিয়ে কোন না কোন কাজের ছুতো ধরে বেরিয়ে যায়।

সুভাষিণী এখন বেশ কথা বলে, আগের চেয়ে এখন সে অনেক ভাল। নিজেই স্নান করে, খায়, চুল বাঁধে।

ডাক্তার এলেই সুভাষিণী যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আজকাল নিজেই ডাক্তারের জলখাবার এনে দেয়। কোন কোন দিন ডাক্তারের সঙ্গে বাগানে বেড়ায়।

ব্রজবিহারী রায় এ ব্যাপারে কিছুই বলেন না। কারণ ডাক্তারের জন্য আজ তিনি প্রাণাধিক কন্যা সুভাকে ফিরে পেয়েছেন।

বেশ কিছুদিন চলে গেছে।

একদিন সুভাষিণী ডাক্তারের সঙ্গে বাগানে একটা হাস্নাহেনার ঝাড়ের পাশে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ সুভাষিণী বলে বসে— আজ কিন্তু তোমার চোখের চশমা খুলতে হবে।

আশ্চর্য কণ্ঠে বলে ওঠে ডাক্তার— কেন?

এখনও কি তোমার চোখ সারেনি ডাক্তার?

না।

আমি জানি— তুমি ডাক্তার নও।

তুমি তুমি— খুলে ফেল তোমার চোখের ঐ কালো চশমা। খুলে ফেলো তোমার দাড়ি গোঁফ। সুভাষিণী একটানে ডাক্তারের চোখের চশমা খুলে নেয়।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখ থেকে দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে। সুভাষিণী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—কে—কে আপনি? আমি—আমি দস্যু বনহুর।

নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকায় সুভাষিণী তার মুখের দিকে, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—না—না আপনি সে নন। বলুন বলুন আপনি কে?

বিশ্বাস হচ্ছে না? তা না হবারই কথা। কারণ তোমার সঙ্গে আমার দেখা এক অন্ধকারময় রাতে। ডাকাতের হাত থেকে তোমায় বাঁচিয়ে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিলাম— তারপর আর এক রাতে তোমায় এক গাছের নিচে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে তোমাকে নিয়ে গিয়ে এক হাসপিটালে ভর্তি করে দিলাম— মনে পড়ে এসব কথা তোমার?

সুভাষিণী স্তব্ধ হয়ে শুনে যায় ওর কথাগুলো। তাইতো, এসব কথা দস্যু বনহুর ছাড়া আর তো কেউ জানে না। তন্ময় হয়ে তাকায় সে ওর মুখের দিকে, ধীরে ধীরে সমস্ত পুরানো স্মৃতি তলিয়ে যায় কোন অতলে। নতুন করে এই মুখখানাই এঁকে যায় সুভাষিণীর মানসপটে।

সুভাষিণী ধীরে ধীরে মাথা রাখে মধুসেনের বুকে।

মধুসেন ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

এমন সময় চন্দ্রাদেবী একটু কেশে সেখানে উপস্থিত হয়।

চন্দ্রাদেবীর আগমনে চমকে সরে দাঁড়ায় সুভাষিণী। লজ্জিতও হয় সে।

এরপর একদিন চন্দ্রাদেবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। যাকে তারা এতদিন ডাক্তার জানত তিনি আসলে ডাক্তার নন। যাদবগঞ্জের জমিদার পুত্র-মধুসেন। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত কথা চন্দ্রাদেবী চেপে গেল এমন কি নিজ স্বামীর কাছেও সে বলল না এ কথা।

এরপর এক শুভলগ্নে মধুসেনের সঙ্গে সুভাষিণীর বিয়ে হল। বিয়ের পূর্বেই জেনেছিল সুভাষিণী যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে সে দস্যু বনহুর নয়—তার ভাবী স্বামী মধুসেন। তখন দস্যু বনহুরকে প্রায় ভুলে গেছে সে।

বিয়ের দিন।

অগ্নিকুণ্ড সাক্ষী রেখে মধুসেনের পাশে বসে সুভাষিণী যখন বিয়ের মন্ত্র পাঠ করছিল। তখন অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে আশীর্বাদের সুযোগ নিয়ে আর একজন এসে দাঁড়াল। সকলের অলক্ষ্যে সুভাষিণীর হাতে একটি ছোট বাক্স দিয়ে সরে পড়ল সে।

বিয়ের পর চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে নববধুর বেশে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল। গয়না পরাতে গিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল গয়নার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং মূল্যবান একটি নেকলেস রয়েছে। সবাই নেকলে[illegible] [illegible] হল। এত মূল্যের নেকলেস কে দিয়েছে? কিন্তু কেউ বলতে পারে না।

বিদায়কালে চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে গিয়ে কোচওয়ানের মুখে নজর পড়তেই চমকে উঠল। কোচওয়ানের চোখ দুটো তার যেন পরিচিত বলে মনে হল। হঠাৎ একখানা মুখ ভেসে উঠল চন্দ্রাদেবীর মানসপটে। এ যে সেই ডাক্তারের চোখ। গভীর নীল দুটি চোখে অদ্ভুত চাহনি। চন্দ্রা আজও ভুলতে পারেনি সেই দৃষ্টিকে। এবার চন্দ্রাদেবী বুঝতে পারে সেই মূল্যবান নেকলেসখানা কে উপহার দিয়েছে। আবার সে ফিরে তাকাল পাগড়ি আর গালপাট্টায় ঢাকা কোচওয়ানের মুখে। কিন্তু ততক্ষণে কোচওয়ান গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সুভাষিণীর শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে বজরায় চড়ে।

ঘাটে এসে গাড়ি পৌছল। মধুসেন ও সুভাষিণী উঠলো গিয়ে বজরায়। বজরা ছেড়ে দিল।

❑

বজরার ছাদে তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে শুয়ে আছে মধুসেন, পাশে বসে সুভাষিণী। সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মধুসেনের হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে।

আজ দোল পুর্ণিমা।

জ্যোস্নার আলোভে চারদিক ঝলমল করছে। মৃদুমন্দ বাতাসে বজরাখানা হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

মাঝিদের ঝুপ্ ঝুপ্ বৈঠার শব্দ আর নদীর জল উচ্ছ্বাসের কল কল ধ্বনি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

মধুসেন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে। দোল পুর্ণিমার উজ্জ্বল আলোতে সুভাষিণীকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল তার গলার মনিমুক্তা খচিত নেকলেসখানা। মধুসেন হেসে বলল সুভা যেমন সুন্দর তুমি, তেমনি সুন্দর তোমার ঐ মালাখানা। একেবারে অপূর্ব।

সুভাষিণী স্বামীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসে।

মধুসেন নেকলেসের লকেটখানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ লকেটের ঢাকনা খুলে গেল। একি এর মধ্যে কাগজের টুকরা কেন। মধুসেন তাড়াতাড়ি জ্যোস্নার আলোতে কাগজের টুকরাটা মেলে ধরল। মাত্র দুটি শব্দ লেখা রয়েছে তাতে- দস্যু বনহুর। মধুসেনের কণ্ঠ দিয়ে নামটা উচ্চারিত হল।

সুভাষিণী চমকে উঠল, সেও অস্ফুটধ্বনি করে উঠল—দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি এ নেকলেসখানা তারই উপহার। মধুসেন কথাটা বলে তাকাল সুভাষিণীর মুখের দিকে।

সুভাষিণী তখন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মধুসেনের মুখমণ্ডল তখন উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন। এ বিয়ের পেছনে হিতৈষী বন্ধুর মত দস্যু বনহুর তাকে সাহায্য করেছে। বনহুরের এ উপকার সে জীবনে কখনও ভুলবে না।

মধুসেন সুভাষিণীকে ভাবাপন্ন হতে দেখে বলে ওঠে—কি ভাবছো সুভা?

সুভাষিণীর বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস—বলে, সে কিছু না।

মধুসেন ওকে টেনে নেয় কাছে।

বজরা এখন নারন্দী বনের পাশ কেটে সোনাইদী নদী বেয়ে এগুচ্ছে। রাত গভীর হয়ে এসেছে। ভোর রাতে বজরা গিয়ে পৌঁছবে যাদবগঞ্জে। মধুসেনের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সুভাষিণী।

মাঝিরা আপন মনে বৈঠা চালিয়ে চলেছে। হাতগুলো তাদের শিথিল হয়ে আসে। ঝিমুতে ঝিমুতে বৈঠা মারছিল ওরা।

দোল পুর্ণিমার চাঁদখানা কখন যে ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে মধুসেন বা সুভাষিণী কেউ জানে না।

হঠাৎ একটা হই হই চিৎকারে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বামীকে আঁকড়ে ধরল সুভাষিণী। বজরার মধ্যে যেন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মশালের আলোতে দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নদীবক্ষ। অস্ত্রের ঝনঝন আর রাইফেলের গর্জন সুভাষিণীর কানে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিল। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল সে চারদিকে।

মাঝিদের আর্ত চিৎকার ভেসে এলো তার কানে—বাবু ডাকাত পড়েছে ----বাবু ডাকাত পড়েছে---- মেরে ফেলল----মেরে ফেলল তার পরপরই নদীবক্ষে ঝুপ ঝুপ শব্দ। মাঝিরা লাফিয়ে পড়েছে নদীর পানিতে।

মধুসেন অসহায়ের মত তাকাল স্ত্রীর ভয়ার্ত মুখের দিকে। ততক্ষণে কয়েকজন মুখোশ পরা ডাকাত মধুসেনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মধুসেন কিছু বলার পূর্বেই একজন ডাকাত তার মাথায় লাঠি দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে মধুসেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল বজরার ছাদে। সুভাষিণী আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢাকল। অমনি কে একজন ডাকাত তার গলা থেকে মূল্যবান নেকলেসখানা একটানে খুলে নিল।

সুভাষিণী দেখতে পেল তাদের বজরার পাশে কয়েকটা ছিপ নৌকা এবার ডাকাতের দল তার বিয়ের যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে বজরা থেকে লাফিয়ে পড়তে লাগল ঐ ছিপ নৌকাগুলোর ওপর।

মাত্র কিছু সময়, তারপর সব নিস্তব্ধ। শুধু এবার শোনা যেতে লাগল বজরার মধ্য হতে বরযাত্রীদের কাতর আর্তনাদ— বাবা গো মেরে ফেলল— গো-ডাকাত! ডাকাত!

❑

দস্যু বনহুর দরবারকক্ষের একটি সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট। তার সামনে দণ্ডায়মান তার কয়েকজন অনুচর। সকলেরই হাতে সুতীক্ষ্ম বর্শা। কার হাতে রাইফেল।

বনহুরের সামনে স্তূপাকার মালপত্র। এইমাত্র তাঁরা ঐসব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে এসেছে। জিনিসগুলো অতি মূল্যবান।

বনহুর মালপত্রগুলো পরীক্ষা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল—এ যে দেখছি সব নতুন ঝকঝকে। কোন বিয়ের যৌতুকের জিনিসপত্র বলে মনে হচ্ছে।

একজন বলল হ্যাঁ সর্দার তাই। আমরা একটা বিয়ের বরযাত্রীর বজরায় হানা দিয়ে এসব লুট করে এনেছি।

অন্য একজন দস্যু একছড়া নেকলেস বের করে বনহুরের হাতে দিল— সর্দার, এটা নতুন বৌ এর গলা থেকে কেড়ে নিয়েছি।

নেকলেসটা হাতে নিয়েই চমকে ওঠে বনহুর, অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে— একি!

দস্যুটা মনে করে মূল্যবান নেকলেসখানা দেখে সর্দার বিস্মিত হয়েছে। সে বুক ফুলিয়ে গর্ভ ভরে বলে— সর্দার, বৌটার স্বামীকে লাঠির এক আঘাতে অজ্ঞান করে দিয়েছি।

গর্জে ওঠে বনহুর— কি বললে?

হ্যাঁ সর্দার, নইলে নেকলেসখানা পাওয়া মুশকিল হত। খুব দামী ওটা।

তা আমি জানি। রহমত! রহমত! চিৎকার করে ওঠে বনহুর।

একজন দস্যু বলল— সর্দার, রহমত আমাদের দলে ছিল না। তাকে তো আপনি যাদবপুরে পাঠিয়েছেন। যাদবপুরের অন্ধ রাজা মোহন্ত সেনকে সাহায্য করতে। তিনি নাকি খুবই বিপদগ্রস্ত এবং ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই আপনার আদেশে সে যাদবপুর গেছে।

ও, রহমত তাহলে সেখানেই গেছে। কিন্তু তোমরা কার হুকুমে বজরা লুট করলে?

দলপতিগোছের অনুচরটি বলে ওঠে— আপনিই তো বলে দিয়েছেন সর্দার— যেখানে যা পাবে লুট করে আনবে।

তাই বলে --- কথা শেষ করতে পারে না বনহুর। দ্রুত পায়চারি করতে থাকে।

সর্দারকে গভীর চিন্তাযুক্তভাবে পায়চারী করতে দেখে ভীত হয় তার অনুচরগণ। না জানি তাদের কাজের মধ্যে কি দোষ খুঁজে পেয়েছে তাদের সর্দার।

হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে বলে ওঠে বনহুর— যাও তোমরা।

সর্দার এসব জিনিসপত্র কি গুদামে রাখব?

না?

কি করব?

সাগরের জলে ফেলে দাও। যাও।

দস্যুগণ বিস্মিত হল, কিন্তু সর্দারের কথায় কোনো প্রশ্ন করার সাহস হলো না ওদের। এক একজন এক একটা মাল উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর দলপতিগোছের লোকটাকে ডাকল—এই শোন।

সর্দার!

তোমার নাম কি?

অবাক হলো অনুচরটা তাদের সর্দার আজ এমন হলো কেন। তার নামটাও ভুলে গেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল— আমার নাম কাসেম।

এ নেকলেস কে এনেছে?

সর্দার আমি।

নেকলেসখানা ছুঁড়ে দিল বনহুর কাসেমের দিকে— এটা যার গলা থেকে কেড়ে নিয়েছ তাকে ফেরত দিয়ে এসো।

ফেরত দেব!

হ্যাঁ—যাও বিলম্ব কর না।

আচ্ছা সর্দার। নতমুখে কাসেম বেরিয়ে গেল দরবারকক্ষ থেকে। মনে তার নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল। এমন তো কোনদিন হয় না। লুটের মাল তো কোনদিনও ফেরত দেয়নি সর্দার। বিলিয়ে দিয়েছে গরীব-দুঃখীর মধ্যে। আজ এক আশ্চর্য ব্যাপার। কোথায় আবার খুঁজে পাব সেই নতুন বৌকে। ফেরত না দিলে মৃত্যু অনিবার্য। সর্দারের নিকট অপরাধীর ক্ষমা বলে কোনো জিনিস নেই। কাসেমের মুখ চূণ হয়ে গেল।

সে নেকলেসখানা এনে ভেবেছিল সর্দার আজ খুব খুশি হবে। হয়তো তাকে মোটা বখশিস দেবে, কিন্তু হল বিপরীত। এখন যার নেকলেস তাকেই খুঁজে বের করে সেটা ফেরত দিতে হবে।

❑

দেশময় সাড়া পড়ে গেল— দস্যু বনহুর মাধবপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যা সুভাষিণীর বজরায় হানা দিয়ে তার সমস্ত যৌতুকের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

ব্রজবিহারী রায় স্বয়ং পুলিশ অফিসে গিয়ে ডায়রী করলেন, জামাতা মধুসেনকে আহত অবস্থায় এনে ভর্তি করে দিলেন শহরের হসপিটালে। বিয়ের রাতে এতবড় একটা অমঙ্গলে মুষড়ে পড়লেন রায়বাবু।

সুভাষিণীও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে দস্যু বনহুর এভাবে তাদের বজরায় হানা দিতে পারে।

এক সময় কথাটা মনিরার কানেও পৌছল। জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যার কণ্ঠ থেকে মূল্যবান নেকলেস ছিঁড়ে নিয়েছে দস্যু বনহুর, তাও শুনল সে।

মনিরার মনটা হঠাৎ রাগে— অভিমানে ভরে উঠল। ক'দিন আগেই শুনেছে, দস্যু বনহুর একজন নিরপরাধ শিকারী ভদ্রলোককে গুলি করে হত্যা করেছে। এখানে রাহাজানি, সেখানে লুটতরাজ, ওখানে নরহত্যা এসব নিয়ে যেন মেতে উঠেছে দস্যু বনহুর।

আজ প্রায় এক মাস হতে চলেছে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে মামা মামীর নিকটে পৌছে দিয়েছে। কই সে তো একটি দিনের জন্যও তার সন্ধান নিতে এলো না। দস্যুর মন তো এমনি নিঠুরই হয়। ওকে একটিবার দেখার জন্য মনিরা ছটফট করে চলেছে। প্রতিদিন রাতে মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে মনিরা— ঐ বুঝি এলো সে।

যখন পা ধরে আসে তখন বিছানায় এসে পা এলিয়ে দেয়। তন্দ্রায় ঘোরে সামান্য একটা শব্দ হলেও চমকে উঠে মনিরা। ছুটে আসে জানালার পাশে— কিন্তু কোথায় সে। নিশীথ রাতের দমকা হাওয়া তার বন্ধ জানালায় আঘাত করেছিল। বিষণ্ন মনে আবার ফিরে এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়ে ওঠে। বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। ভাবে মনিরা, চিরদিন বুঝি এমনি করে ওর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে হবে তাকে। তারপর এক সময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে সে নিজেই জানে না।

এবার আসার পর মনিরা লক্ষ্য করেছে তার মামুজান বেশ গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। আগের মত তাকে পাশে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন না। খাবার টেবিলে তাকে না দেখলে উদগ্রীব নয়নে বারবার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন না। যতক্ষণ মনিরা টেবিলে না এসেছে ততক্ষণ চৌধুরী সাহেব খাবার মুখে দেননি। আজ মনিরার জন্য অপেক্ষা করেন না। এখন খাবার টেবিলে ওকে না দেখলেও মরিয়ম বেগমকে কোন প্রশ্ন করেন না। আপন মনে খেয়ে বেরিয়ে যান।

মনিরার ওপর স্বামীর এই উদাসীনতা লক্ষ্য করে মরিয়ম বেগম অন্তরে ভীষণ আঘাত পেতেন। একটা গভীর বেদনা তাকে নিষ্পেষিত করে চলত। মাতা-পিতাহারা অসহায় মেয়েটি যে আজ পর্যন্ত ওঁদের মুখ চেয়েই বেঁচে আছে, আজ যদি তাঁরাই ওর প্রতি বিরূপ হন, তা হলে সে বাঁচবে কি করে।

মনিরার ওপর চৌধুরী সাহেবের এই বিদ্রূপ মনোভাব শুধু মরিয়ম বেগমকে ব্যথিত করেনি, মনিরাও ভীষণ দমে গেছে। মরমে যেন মরে গেছে সে। সেদিন যখন মিঃ হারুনের সঙ্গে এ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো মনিরা—মামুজানের অন্ধকার মুখমণ্ডল দেখে মুহূর্তে তার সমস্ত হৃদয় চূর্ণ

বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মনিরা মামুজানের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার সাহস করেনি। কোন দিন হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে সে।

কিন্তু মনিরার তো কোন দোষ নেই। নিষ্পাপ ফুলের মত এখনও সে পবিত্র।

চৌধুরী সাহেব মনিরাকে যতই দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলেন, মরিয়ম বেগম ততই ওকে গভীর স্নেহের আবেষ্টনীতে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন এতটুকু মুখ ভার দেখলে মরিয়ম বেগম অস্থির হয়ে পড়তেন—কি হয়েছে মা? শরীর ভাল আছে তো? মাথা ধরেছে বুঝি? এমনি নানা প্রশ্নে মনিরাকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন তিনি।

মনিরা জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী— সব বুঝতো সে। মামীমা তার অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান, বাইরের কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা মনিরার মনকে যেন বিষাক্ত করে তুলতে না পারে অবিরত সে চেষ্টাই করতেন মরিয়ম বেগম।

মামীমার প্রাণঢালা স্নেহ-ভালবাসা মনিরার অতৃপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিলেও মামুজানের উপেক্ষা তাকে মর্মাহত করে তুলত। আড়ালে বসে চোখের পানি ফেলত সে।

নিজের অদৃষ্টকে নিজেই ধিক্কার দিত মনিরা। না হলে এত ছোট বেলায় মা-বাবাকে হারাবে কেন? আজ সে বিশাল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। একদিকে তার মাতা-পিতার অগাধ ধন-সম্পদ অন্যদিকে মামা-মামীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য— এত থেকেও আজ সে চির দুঃখিনী— হতভাগিনী।

যদি তার অদৃষ্ট মন্দই না হবে, তাহলে মনিরই বা হঠাৎ নদীর পানিতে হারিয়ে যাবে কেন? হারিয়েই যদি গেল তবে আবার সে তার জীবন পথে স্বাভাবিকভাবে ফিরে না এসে অস্বাভাবিকভাবে ফিরে এলো কেন?

বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে মনিরা। অথৈ সাগরে যেন কোন সম্বল পায় না সে আঁকড়ে ধরার। যত রাগ, যত অভিমান হয় মনিরের ওপর। কেন, ইচ্ছে করলে সে কি সৎপথে আসতে পারে না? তাহলেই তো মনিরার কোন দুঃখ বেদনাই থাকে না। হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ যেন তার পিঠে হাত রেখেছে বলে মনে হল তার।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল মনিরা। তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। তার মনির এসেছে তার পাশে।

মনিরা কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বনহুর মনিরার মাথায় হাত রেখে বলে— মনিরা, একি কাঁদছ কেন?

না না, তুমি যাও। তুমি যাও।

মনিরা, কি হল তোমার?

কিছু না।

অনেকদিন পরে এলাম তোমার হাসিভরা মুখ দেখব কিন্তু ..

তুমিই আমার জীবনটা দুর্বিসহ করে তুলেছ। তুমি আমায় হাসতে দিলে না মনির।

জানো, আজ আমার হৃদয়ে কি অসহ্য ব্যথা গুমরে কেঁদে মরছে? শুধু তোমার জন্য আজ আমি মনে এতটুকু শান্তি পাচ্ছি না। কিসের অভাব তোমার--- তবু কেন তুমি এসব করছ? কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মনিরা।

তা পারবে কেন, তুমি যে দস্যু— ডাকু ..

এ তো পুরনো কথা।

আচ্ছা, চিরদিন কি তুমি এসব করবে? চুরি-ডাকাতি লুটতরাজ ছাড়া আর কি কোন কাজ নেই তোমার?

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে বনহুর।

মনিরা, তাড়াতাড়ি দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে বনহুরের মুখে চাপা দেয়— থাম।

মনিরা অভাবের তাড়নায় আমি এসব করি না। এসব আমার নেশা।

নরহত্যা তোমার নেশা?

দস্যু বনহুর কোনদিন বিনা কারণে নরহত্যা করে না।

একটা নির্দোষ বেচারী শিকারী ভদ্রলোককে তুমি হত্যা করনি?

মাধবপুরের জমিদারের কন্যার কণ্ঠ থেকে তুমি হার ছিঁড়ে নাওনি?

আমি নেইনি, নিয়েছে আমার অনুচরগণ।

সে তোমার আদেশেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ একটা সামান্য হারের জন্য তুমি...

মনিরা— সে হার তাকে ফেরতে পাঠানো হয়েছে।

নিলেই বা কেন আবার ফেরতই বা পাঠালে কেন?

সব কথা তুমি নাইবা শুনলে।

শুনতে আমি চাই না। শুধু বল, তুমি আর ওসব করবে না। বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে মনিরা।

বনহুর পূর্বের ন্যায় হেসে ওঠে— হাঃ হাঃ হাঃ!

মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে তার বুকে— আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না মনিরা, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না..

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে, তারপর বলে— মনিরা, নারী হৃদয় বড়ই কোমল। শুধু কোমল নয়, দুর্বলও। তাই তুমি সামান্য কিছু হলেই সহ্য করতে পার না।

কি বললে, তোমার কাজ সামান্য! রাহাজানি, লুটতরাজ, নরহত্যা— এসব— সামান্য?

নয়তো কি? দস্যু বনহুরের কাছে এসব অতি নগণ্য। জানো মনিরা, এই মুহূর্তে আমি নিজের বুকে গুলি চালাতে পারি!

তুমি সবই পার--- পাষন্ড, তুমি সব পার। কিন্তু সে ব্যথা যে আমার কাছে কত দুর্বিষহ তা জানো না। প্রতি মুহূর্তে তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমি যে কত অস্থির থাকি, তুমি তা জানো না।

মনিরা, এই হতভাগার জন্য কেন তুমি চিন্তা কর। কেন তুমি ভাব?

নিষ্ঠুর! সত্যই তোমার হৃদয় পাষাণে গড়া। জানো না তুমি তোমার মনিরার কতখানি। কন্ঠঁরোধ হয়ে আসে মনিরার।

বনহুর অবেগমধুর কণ্ঠে ডাকে— মনিরা!

বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে মনিরা— আর কত দিন আমাকে এমনি করে কাঁদাবে তুমি? তুমি তো ঐ সব নিয়ে মেতে থাক, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকি বল?

আম্মা-আব্বার সেবা-যত্নের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিও, শান্তি পাবে।

তা জানি কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার সব অন্ধকার।

তুমি নিতান্ত বালিকার মত কথা বললে মনিরা। দস্যু বনহুরকে তুমি মায়ার বাঁধনে বাঁধতে চাও। কিন্তু তা কোন দিনই হবার নয় মনিরা।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা— কি বললে? আমার সমস্ত আকাশ কুসুম ধূলিসাৎ করে দিলে। মুছে দিলে আমার হৃদয়ের সমস্ত বাসনা। ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল মনিরা মেঝের কার্পেটে, উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেংগে পড়ল সে।

বনহুর কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর মনিরার পাশে এসে বসল, পিঠে হাত রেখে ডাকল— মনিরা! আবার ডাকল সে— মনিরা, তুমি যা চাও— তাই পাবে। ওঠো মনিরা—

মনিরা ধীরে ধীরে কার্পেট থেকে উঠে বলল— সত্যি দেবে?

কি চাও তুমি?

তোমাকে।

আমি তো তোমারই।

মনির!

হাঁ মনিরা।

মনিরা বনহুরের চোখ দুটির দিকে স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল। এমন করে কোনদিন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেনি।

দূর থেকে ভেসে আসছে মোরগের কণ্ঠস্বর। ভোর হবার আর বেশি দেরী নেই।

বনহুরকে বিদায় দিয়ে মনিরা শয্যায় গা এলিয়ে দিল। একটা অনাবিল আনন্দ মনিরার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাকে মুছে নিয়ে গেছে। মনির আর কারও নয়— শুধু তার।

❑

সেদিনের পর থেকে নূরীর মনের শান্তি চিরতরে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। লজ্জায়-অভিমানে নূরী আজ পর্যন্ত বনহুরের সম্মুখে আসেনি। অসহ্য একটা দাহ তার অন্তরে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছিল। বনহুরকে নূরী শুধু ভালবাসতো তা নয়, তার জীবনের সাথী হিসাবে ওকে সে গ্রহণ করেছিল। গোটা পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাক, তবু নূরী ওকে ভুলবে না— ভুলতে পারে না।

নূরী যদিও এতদিন বনহুরের সামনে আসেনি, তবুও সে একটি দিনও ওকে না দেখে থাকতে পারেনি। প্রতিদিন সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটি বারের জন্য বনহুরকে দেখে যেত। যতক্ষণ বনহুর বাইরে থেকে ফিরে না আসত ততক্ষণ নূরী ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করত ওর।

বনহুর ফিরে এলে তাকে একটি বারের জন্য দেখে এসে তবেই সে শয্যা গ্রহণ করতো।

একদিন বনহুর সকালে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এলো না। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল তবু তার দেখা নেই। নূরী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল না জানি কোন বিপদে পড়েছে সে! ব্যস্ত হয়ে বারবার অনুচরদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল কোথায় গেছে বনহুর। আর কে গেছে তার সঙ্গে। এতক্ষণ ফিরে এলো না কেন? নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তুলল নূরী সবাইকে।

অনুচরগণ নূরীর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে হাসল, একজন বলল— সর্দার কচি বাচ্চা নয়—হারিয়ে যাবে না।

নূরী রাগের বশে তাকে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল। তারপর গট গট করে চলে গেল নিজের কক্ষে।

দস্যু বনহুরের অনুচর সে। একটা নারীর হাতের চড় খেয়ে নিশ্চুপ থাকবে। রাগে অধর দংশন করলো। অনুচরটির নাম হাংলু। জাতিতে সে ছিল পাঠান। যেমন রাগী, তেমন দুঃসাহসী।

নূরীর চড় খেয়ে রাগ তার চরমে উঠল। নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁত পিষল সে।

নূরী কিন্তু নিজের কক্ষে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না। বনহুরের জন্য মনটা তার ছটফট করতে লাগল।

ক্রমে রাত বেড়ে এলো। এক সময় বিছানার কোলে আশ্রয় নিল নূরী। নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল সারাটা দিনের অবসাদ আর ক্লান্তি তাকে টেনে নিয়ে গেল বিস্মৃতির পথে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো নূরী— জ্যোস্না প্লাবিত রাত। বনানী ঢাকা ঝরণার পাশে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে বনহুর। নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে আংগুল বুলিয়ে দিচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাস অজানা ফুলের সুরভি নিয়ে তাদের জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। ফুটফুটে জ্যোস্নার আলোতে বনহুরকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল গভীর নীল দুটি চোখে মায়াময় চাহনি। বনহুর নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নূরী হেসে বলে—হুর, অমন করে কি দেখছ?

বনহুর দু'হাতে নূরীর গলা বেষ্টন করে বলে— তোমাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশে ঘনিয়ে আসে একরাশ কালো মেঘ। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে পুর্ণিমার চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখখানা নূরীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। নূরীর কোলে বনহুর শুয়ে আসে. তবু সে তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না— নূরীর হাত দিয়ে বনহুরের মুখখানা অনুভব করার চেষ্টা করে।

হঠাৎ শুরু হয় ঝড়, বৃষ্টি, তুফান। আকাশে মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের কড়কড় ধ্বনি। নূরী আর বনহুর, সেই তুফানের মধ্যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নূরী ব্যকুল আগ্রহে ডাকে—হুর—হুর কোথায় তুমি। হুর-তুমি কোথায়— ঝড়ের মধ্যে দু'হাত প্রসারিত করে খুঁজতে থাকে সে বনহুরকে।

গাছের ডাল ভাঙছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। নূরী আকুলভাবে খুঁজে চলেছে বনহুরকে। কখনও গাছের গুঁড়িতে আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়েছে। কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। প্রাণফাটা চিৎকার করে শুধু ডাকছে—হুর—হুর, কোথায় তুমি— কোথায় তুমি— হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলো। স্বচ্ছ আকাশের বুকে হেসে উঠল পুর্ণিমার চাঁদ। নূরী উম্মাদিনীর ন্যায় বনহুরের সন্ধানে চারদিকে তাকাল। একি, ঐ তো তার প্রাণাধিক।

স্বচ্ছ নীল আকাশে ঠিক চাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন তারই মত সুন্দরী যুবতী— এলোমেলো চুল, অশ্রুসিক্ত নয়ন, দু'হাত মেলে বনহুরকে ডাকছে।

বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সেই যুবতীর দিকে। দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে বনহুর।

নূরী চিৎকার করে ওঠে— হুর ফিরে এসো। ফিরে এসো --- অমনি নূরীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। একি স্বপ্ন দেখেছিল সে। গোটা শরীর ঘামিয়ে উঠেছে। গলাটা কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখের পানিতে বালিশটা ভিজে চুপসে উঠেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে নূরী। স্তব্ধ হয়ে ভাবে স্বপ্নের কথা। টনটন করে ওঠে বুকের ভেতরটা। সত্যি কি তবে হুর এমনি করে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। না না, তা হতে পারে না। নূরীর জীবনের একমাত্র সম্বলই হুর। ওকে ছাড়া নূরী বাঁচতে পারে না। কিন্তু কাল সে তো ফিরে আসেনি। এখনও ফিরে এসেছে কিনা কে জানে?

নূরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে এগুলো বনহুরের কক্ষের দিকে।

কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল নূরী, কক্ষে আলো জ্বলছে। অনেকটা আশ্বস্ত হল— যাক, তাহলে হুর ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

ভাবল, এখন নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে ঘুমোবে। কিন্তু ওকে একটিবার না দেখে ফিরে যেতে পারল না নূরী। মনটা বড় অস্থির হলো, দরজা ঠেলে উঁকি দিল ভেতরে।

আলোটা দপ দপ করে জ্বলছে।

একি, বিছানায় অর্ধ শায়িত অবস্থায় বনহুর শুয়ে আছে। এত রাতেও ঘুমায়নি সে। নূরী, ধীরে ধীরে মুখটা ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ হলো। নূরী চমকে উঠল— এবার সে ধরা পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই হুর ছুটে আসবে। ছিঃ ছিঃ! কি ভাববে হুর। কিন্তু কই হুরতো ছুটে এলো না। তবে কি সে শুনতে পায়নি। তা কেমন করে হয়, শব্দটা বেশ জোরেই হয়েছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে হুর, নইলে সে এমন নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

নূরী এবার অতি সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করল। লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো বনহুরের বিছানার পাশে। কালো পাগড়ীটা শুধু খুলে রেখেছে টেবিলে আর রিভলভারখানা। অন্যান্য ড্রেস এখনও বনহুরের শরীরে পরা রয়েছে এমন কি জুতো জোড়াও রয়েছে তার পায়ে।

নূরী অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল বনহুরের নিদ্রিত মুখমণ্ডলের দিকে। বালিশের উপরে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে সে, দক্ষিণ হাতখানা বুকের উপর। বাম হাতখানা একপাশে। পা দু'খানা অর্ধঝুলিত অবস্থায় রয়েছে।

নূরী ভুলে গেল, বনহুরের কাছ থেকে সে এখন দূরে সরে রয়েছে। ভুলে গেল রাগ অভিমান। অতি ধীরে ধীরে বনহুরের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে রাখল তারপর সন্তর্পণে পা দু'খানা রাখল খাটের ওপরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর নিদ্রা ছুটে গেলো, চমকে উঠে বসল। উজ্জ্বল আলোতে দেখল নূরী দাঁড়িয়ে আছে তার খাটের পাশে। বনহুর নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সব।

নূরী, এবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

বনহুর ডাকল– নূরী।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নূরী। কিন্তু ফিরে তাকাবার সাহস পেল না সে।

বনহুর ডাকল– শোন নূরী।

নূরী ধীর পদক্ষেপে বনহুরের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টি নত রয়েছে ওর।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল– বসো।

নূরী তবুও বসল না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল!

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় ছেপে ডাকল- নূরী!

এতক্ষণে নূরী চোখ তুলে একবার বনহুরের দিকে তাকাল, পুনরায় দৃষ্টি নত করতে যাচ্ছিল সে বনহুর ওর চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করে ধরে—উঁ হুঁ আমার দিকে তাকাও। বল, কেন তুমি এখানে এসেছিলে?

নূরী নীরব।

বনহুর ওকে টেনে বসিয়ে দেয় নিজের পাশে, তারপর হেসে বলে- পাগলী, আমার ওপর রাগ করে খুব কষ্ট পেয়েছ, না?

নূরী এবারও নিশ্চুপ।

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে— কই, আগের মত আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিলে না?

নূরী আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না—হঠাৎ দু'হাতের মধ্যে মুখ রেখে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠে।

বনহুর আশ্চর্য কণ্ঠে বলে—একি, আবার কেন কাঁদছ?

না না, তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না হুর, জিজ্ঞাসা কর না।

তোমরা নারীজাতি, শুধু কাঁদতেই জানো, শুধু কান্না আর কান্না, এ ছাড়া আর কিছুই নেই তোমাদের?

হুর, তোমাকে ভালবেসে কান্না ছাড়া আর যে কোন পথ নেই।

নূরী, আমার কি জন্ম শুধু তোমাদের কাঁদাবার জন্য? যেদিকে তাকাই শুধু চোখের পানি আর চোখের পানি! শিশুকালে মা- বাবাকে কাঁদিয়েছি। তাই বুঝি আমার জীবনে এ একটি চরম অভিশাপ। যে দিকে তাকাই শুধু কান্নাই দেখতে পাই। কান্না ছাড়া কেউ যেন হাসতে জানে না।

হুর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সে দিন তোমার কাছে যে অপরাধ আমি করেছি, জানি তার ক্ষমা নেই, তবু বল তুমি আমাকে............

অনেক হয়েছে! নূরী, দস্যু কোনদিন রাগ-অভিমান জানে না, যা যখন ঘটে তখনই তার শেষ হয়। তোমার কোন দোষ নেই।

হুর! নূরী বনহুরের বুকে মাথা রাখল। একটা অন্ধকার কালো মেঘ ধীরে ধীরে নূরীর মন থেকে সরে গেল। কতদিন নূরী এমনি করে বনহুরের বুকে মাথা রাখতে পারেনি। একটা অনাবিল আনন্দ তার সমস্ত হৃদয়ে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

নূরী যখন বনহুরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো, তখন অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়াল।

নূরী এগিয়ে চলেছে তার ঘরের দিকে। কিছু পূর্বে যে ব্যথার আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, এখন তা আর নেই। ধুয়ে-মুছে সব পরিস্কার হয়ে গেছে। বনহুরের একটা কথায় সব ভুলে গেল নূরী।

নূরী এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে তার এগিয়ে চলেছে একটা ছায়ামূর্তি। যেমনি নূরী নিজের কক্ষে প্রবেশ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে নূরীকে ধরে ফেলল একটা বলিষ্ঠ লোক। নূরী চিৎকার করার পূর্বেই লোকটা তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কাঁধে উঠিয়ে নিল, তারপর অন্ধকারে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

বনহুর বিছানায় শুয়ে হঠাৎ শুনতে পেল তাদের আস্তানা থেকে একটা অশ্ব-পদশব্দ যেন দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। এ অসময়ে কে তাদের আস্তানা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে? ব্যাপারটা তার কাছে স্বচ্ছ মনে হল না। বনহুর বিছানায় সোজা হয়ে বসল, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

এমন সময় একজন অনুচর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল- সর্দার, সর্দার......

বনহুর তড়িৎ গতিতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল, তারপর টেবিল থেকে রিভলভারখানা তুলে নিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল- কে, মহসীন?

সর্দার, হাংলু নূরীকে নিয়ে ভেগেছে... ঐ শুনা যাচ্ছে তার ঘোড়ার খুরের শব্দ।

তোমরা দেখেছ, বাধা দাওনি?

সর্দার, আমরা দু'জনে পাহারায় ছিলাম, বাধা দিতে গেলে একজনকে হাংলু হত্যা করছে ...

বনহুর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না, ছুটে বেরিয়ে যায়— সে অশ্বালয়ের দিকে। গেটের পাশেই দেখতে পায় তার নিহত অনুচরটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। একখানা ছোরা আমূল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বুকে।

বনহুরের এসব দেখার সময় নেই। একবার মাত্র তাকিয়ে দেখে নিয়ে অশ্বালয়ে প্রবেশ করে। অতি দ্রুত তাজকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর চেপে বসে তাজের পিঠে।

হাংলুর অশ্ব পদশব্দ ততক্ষণে অনেক দূরে সরে গেছে।

বনহুর তাজের পিঠে উল্‌কাবেগে ছুটল। চোখ দু'টি দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। নূরীকে নিয়ে হাংলু পালিয়েছে, এতবড় সাহস তার! বনহুর দাঁতে অধর চেপে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করে। এ ইবুঝি সে প্রথম তাজের পিঠে কষাঘাত করল।

তাজ বুঝতে পারে তার মুনিব আজ প্রকৃতিস্থ নয়। কাজেই নিজের গতি আরও বাড়িয়ে দেয়, সে।

রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে তাজ ছুটে চলেছে। পূর্বের অশ্ব-পদশব্দ অতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বনহুর বারবার তাজের পেটে পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। জোরে, আরও জোরে ছুটতে লাগল তাজ।

❑

হাংলু নূরীকে এঁটে ধরেছিল।

নূরী যতই হাংলুর হাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল ততই হাংলুর বলিষ্ঠ হাতখানা তার দেহে সাঁড়াশীর মত বসে যাচ্ছিল। প্রাণফাটা চিৎকার করে মাঝে মাঝে ডাকছিল ----- হুর --হুর--

নূরীর চিৎকারে গহন বনের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেংগে পড়ছিল। বনের পশু-পক্ষী পর্যন্ত সচকিত হয়ে উঠেছিল। নূরীকে নিয়ে হাংলু একটা প্রান্তরে এসে পড়ে।

চারদিক ধু ধু মাঠ। কোথাও আগাছা বা ঝোপঝাড়ের চিহ্ন নেই। নূরীকে চেপে ধরে হাংলু অশ্ব চালনা করছে। সরীসৃপের যত সরু একটা রাস্তা আকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে দূরে। সে সরু পথ ধরে হাংলু অশ্ব চালাচ্ছিল।

বনহুরের অশ্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই হাংলুর অশ্বের নিকটবর্তী হল। যদিও বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, প্রান্তরের মধ্যে এসে অন্ধকারটা বেশ অনেকখানি হালকা হয়ে এসেছে। বনহুর দেখতে পেল, অন্ধকারের প্রান্তরের বুক চিরে একটা অশ্ব দ্রুত সামনে এগোচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারল, এটাই হাংলুর অশ্ব এবং অশ্বপৃষ্ঠে হাংলুর কঠিন বাহু বন্ধনের মধ্যে রয়েছে নূরী। নইলে বনহুরের রিভলভার এতক্ষণে গর্জন করে উঠত।

বনহুরের অশ্ব-পদশব্দও হাংলুর কানে পৌঁছে ছিল। একবার মাত্র পেছনে তাকিয়ে দেখেছিল সে। তারপর প্রাণপণে অশ্ব চালনা করতে লাগল। মরিয়া হয়ে ছুটেছে সে।

বনহুরের অশ্বও উল্কাবেগে ছুটে আসছে তার দিকে। সেকি অদ্ভুত গতি তাজের।

হাংলু প্রাণ ভয়ে অশ্বচালনা করছে। বনহুর তাকে ক্ষমা করবে না। নূরীকে চুরি করার অপরাধে তাকে গুলি করে হত্যা করবে।

বনহুর হিংস্র জন্তুর ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটছে। এই মুহূর্তে হাংলুকে সে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করবে।

তীর বেগে ছুটে আসছে বনহুর। নিঃশ্বাস তার দ্রুত বইছে। মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে। নিকটে অতি নিকটে এসে পড়েছে বনহুর।

বনহুর তাজকে নিয়ে হাংলুর অশ্বের পাশে পৌঁছে গোল, এক ঝটকায় হাংলুকে টেনে মাটিতে ফেলে দিল।

হাংলু পড়ে যেতেই নূরী বনহুরের বুকে ঝাপিয়ে পড়ল।

বনহুর নূরীকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিল। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে তাকাল হাংলুর দিকে।

হাংলুর মুখমণ্ডল তখন বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণ হাংলুর মধ্যে যে একটা হিংস্র ভাব জেগেছিল মুহূর্তে তা অদৃশ্য হল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলো। হাতজোড় করে দাঁড়াল সে।

বনহুর নূরীকে সরিয়ে দিয়ে কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। হাংলুর দিকে– শয়তান!

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে হাংলু– মাফ করুন সর্দার।

দাঁতে দাঁত পিষলো বনহুর। তারপর রিভলভার উঁচু করে ধরল, পরমুহূর্তেই বনহুরের রিভলভার গর্জন করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হাংলুর রক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়ল প্রান্তরের মধ্যে

নূরী ছুটে এসে বনহুরের হাত চেপে ধরল—একি করলে হুর।

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে বলল—চলো নূরী।

নূরীকে নিজের অশ্বপিঠে চাপিয়ে নিজেও উঠে বসল। ফিরে চলল এবার তারা আস্তানার দিকে।

পেছনে প্রান্তরের মধ্যে পড়ে রইল হাংলুর মৃতদেহ। পাশে দাঁড়িয়ে হাংলুর অশ্ব।

প্রান্তর ছাড়িয়ে এবার বনহুর আর নূরী তাজের পিঠে গহন বনের মধ্যে প্রবেশ করল।

নূরীর মনে আজ অফুরন্ত আনন্দ!

হুর যদি তাকে ভালই না বাসবে, তবে তার জন্য এত উদ্বিগ্ন হবে কেন? তাকে বাঁচানোর জন্য বনহুরের সেকি প্রাণঢালা প্রচেষ্টা।

নূরী নিজেকে বিলিয়ে দিল বনহুরের মধ্যে।

❑

শহরের বিশিষ্ট নাগরিক বণিক ভগবৎ সিং তার রাজ প্রাসাদ সমতুল্য বাড়িতে আজ একটা পার্টি দিচ্ছে। সম্প্রতি তিনি বাণিজ্যস্থল থেকে দেশে ফিরেছেন। শহরের গণ্যমান্য সকলকেই ভগবৎ সিং পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার কাছে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই এ পার্টিতে যোগ দেবে।

ভগবৎ সিং পুলিশ অফিসারগণকেও এ পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছেন? মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন, এমন কি মিঃ জাফরীও আসবেন এ পার্টিতে। মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলমকেও দাওয়াত করেছেন তিনি।

খানবাহাদুর হামিদ খান, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন, ডাক্তার জয়ন্ত সেন, এমন কি চৌধুরী সাহেব পর্যন্ত বাদ পড়েননি। সন্ধ্যা আটটার পর পার্টি শুরু হবে।

ভগবৎ সিং বিকেলে আর একবার পুলিশ অফিসে গিয়ে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনকে নিয়ে মিঃ জাফরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি নিশ্চয়ই যাবেন বলে কথা দিলেন তাকে।

সন্ধ্যার পর থেকেই আমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের আগমণ শুরু হল। বিরাট হলঘরটার মধ্যে বসবার আয়োজন করা হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমণ্ডলীতে হলঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। নানারকম হাসি-গল্পতে ভরে উঠল চারদিক। এখনও পুলিশ অফিসারগণ আসেননি।

মিঃ চৌধুরী এসেছেন– খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর কেউ বাদ যায়নি, সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। এমন সময় মিঃ জাফরী অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে ভগবৎ সিং অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের বসালেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা অতিথিও এসেছেন এ পার্টিতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলে খাবার দেওয়া হল। নানারকম খাদ্য-সম্ভারে ভরে উঠল খাবার টেবিল। মিঃ জাফরী আজ ভগবৎ সিং-এর অতিথি, এটা কম কথা নয়।

খাওয়ার পর্ব প্রায় শেষ হবার পথে, এমন সময় চৌধুরী সাহেব অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে।

মুহূর্তে কক্ষে আলোড়ন শুরু হল। ভগবৎ সিং ছুটে এলেন ওপাশ থেকে। তিনি অতিথিগণের খাওয়া দাওয়ার তদারক করছিলেন। চৌধুরী সাহেব মেঝেতে পড়ে যেতেই মিঃ ভগবৎ সিং চৌধুরী সাহেবের মাথাটা তুলে নিলেন কোলে।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারও এসে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেবের চারপাশে।

ডাক্তার জয়ন্ত সেন চৌধুরী সাহেবের পাশেই বসে খাচ্ছিলেন। তিনি হাতখানা তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কার করে নিয়ে চৌধুরী সাহেবের পাশে বসে পড়লেন। চৌধুরী সাহেবের হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মিঃ আলম একবার ডাক্তার জয়ন্ত সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। চৌধুরী সাহেবের মুখ দিয়ে তখন ফেনাযুক্ত লালা গড়িয়ে পড়ছে।

মিঃ হারুন ঝুঁকে পড়ে বললেন– একি হল? হঠাৎ চৌধুরী সাহেবের হল কি!

ভগবৎ সিং তো হায় হায় করতে শুরু করলেন। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে লক্ষ্য করে বলেন– ডাক্তার বাবু, দেখুন। আপনি একটু ভাল করে দেখুন ভদ্রলোকের হল কি!

মিঃ আলমের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে, কঠিন কণ্ঠে বলেন— চৌধুরী সাহেবকে বিষ পান করানো হয়েছে।

অদ্ভুদ শব্দ করে উঠলেন মিঃ হারুন– বিষ!

মিঃ হোসেন বললেন– দেখছেন না চৌধুরী সাহেবের মুখ দিয়ে কেমন ফেনাযুক্ত লালা গড়িয়ে পড়ছে। বিষ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এ বিষ তার খাবারে কেমন করে এলো। কথাটা বলেন মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ জাফরী কট্‌মট্‌ করে তাকালেন ভগবৎ সিং-এর দিকে। তারপর গর্জন করে উঠলেন– সিং বাহাদুর, আপনার বাড়িতে খাবার খেতে এসে চৌধুরী সাহেবের এ অবস্থা। কাজেই এজন্য আমি আপনাকে দোষী সাবাস্ত করছি।

ডাক্তার জয়ন্ত সেন বললেন– না না, উনার কোন দোষ নেই। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে একই খাবার আমরা কয়েকজন মিলে এক টেবিলে খাচ্ছিলাম। খাবারে বিষ মেশানো থাকলে আমাদের কয়েকজনের অবস্থা এতক্ষণ চৌধুরী সাহেবের মতই হত।

তাহলে চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ এলো কোথা থেকে।

পুনরায় মিঃ জাফরী হুঙ্কার ছাড়লেন।

সমস্ত হলঘরে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কার মুখে কথা সরছে না। হতভম্বের মত তাকাচ্ছেন পুলিশ অফিসারদের মুখের দিকে।

শেষ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে বললেন ভগবৎ সিং চৌধুরী সাহেবকে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তিনি এসবের কিছুই জানেন না।

এদিকে কয়েকজন ভদ্রলোক ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। চৌধুরী তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

ডাক্তারগণ প্রাণপণে চৌধুরী সাহেবকে আরোগ্য করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু সকল আশা বিফল হল। ডাক্তারদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় ভরে উঠল। চৌধুরী সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

সবাই যখন চৌধুরী সাহেবের লাশ ঘিরে ধরে নানারকম আলোচনা করছেন, তখন সকলের অলক্ষ্যে মিঃ আলম বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে।

খবর পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চৌধুরী বাড়ি থেকে ছুটে এলেন সরকার সাহেব এবং মরিয়ম বেগম। মনিরাও এলো তাদের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে কক্ষে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, এক্ষণে সে কক্ষে কান্নার রোল উঠল। মরিয়ম বেগম স্বামীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

মনিরা তো মামুজানের মুখে-বুকে হাত বুলিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। পিতামাতাকে হারানোর পর এই মামা-মামীই ছিল তার সম্বল। মামাকে হারিয়ে মনিরা আজ চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগল।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না।

তিনি চৌধুরী সাহেবের শিহরে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ ঢেকে ছোট্ট বালকের মত ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সরকার সাহেব আজ ত্রিশ বছর পর্যন্ত চৌধুরী বাড়িতে হিসাব নিকাশের কাজ করে আসছেন। চৌধুরী সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক তিনি। সরকার সাহেবই চৌধুরীবাড়ির সর্বক্ষণ দেখাশোনা করতেন। এমনকি বাজারের হিসাবটাও ছিল সরকার সাহেবের হাতে। চৌধুরী সাহেব ভুলেও কোনদিন সরকার সাহেবের নিকট হতে কোনো হিসাব-নিকাশ নিতেন না। তার উপরেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন চৌধুরী সাহেব।

সরকার সাহেবও চৌধুরী সাহেবকে নিজ বড় ভাইয়ের মতই মনে করতেন। চৌধুরী সাহেবের অজ্ঞাতে তিনি কোনদিন একটা পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করতেন না।

এসব কারণেই উভয়ের মধ্যে ছিল একটা নিগুঢ় ভ্রাতৃসম্বন্ধ। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সরকার সাহেবের অস্থিপাঁজর যেন চূর্ণ করে দিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত মিঃ জাফরী লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং যতক্ষণ আসল দোষী ধরা না পড়ে ততক্ষণ ভগবৎ সিং এর উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিলেন।

❑

শোকাতুরা মরিয়ম বেগম এবং মনিরা অসহায়ের মত আকুল হয়ে কাঁদছেন। আজ তারা বড়ই নিরুপায়? একমাত্র তাদের সম্বল ছিলেন চৌধুরী সাহেব। তিনিই আজ চলে গেছেন—শুধু গেছেন নয়, চিরতরে বিদায় নিয়ে গেছেন। আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা চৌধুরী সাহেবের শোকে এতই কাতর হয়ে পড়েন যে, সরকার সাহেব এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা দিয়েও তাদের দু'জনকে এতটুকুও শান্ত পর্যন্ত করতে পারলেন না।

দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোকজন এলেন চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। সবাই চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারও চোখ শুষ্ক রইল না। চৌধুরী সাহেবের এ আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা শহরে একটা শোকের ছায়া পড়ল লোকের মুখে মুখে কাগজে কাগজে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল কথাটা।

চৌধুরী সাহেবের লাশ যখন জানাযার জন্য বাড়ির সম্মুখস্থ বাগানে রাখা হলো, তখন অসংখ্য লোকের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে আর একজন এসে দাঁড়াল গোলাপঝাড়ের পাশে চৌধুরী সাহেবের শিয়রে! নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছিল সে।

জানাযা শেষ হয়ে যায়। কখন যে চৌধুরী সাহেবের লাশ নিয়ে চলে গেছে খেয়ালও নেই ওর। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায়, কঠিন পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখমন্ডল! দাঁতে অধর দংশন করে সে। দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়– চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে এর উপযুক্ত সাজা সে নিজ হাতে দেবে।

যেমন সকলের অলক্ষ্যে একপাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে, তেমনি সকলের অজ্ঞাতে বাগান থেকে বেরিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হল। শুধু একটা তপ্ত নিঃশ্বাস ঘুরপাক খেয়ে ঘুরতে লাগল বাগানটার মধ্যে।

গভীর রাত।

জনমুখর নগরী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। যানবাহন চলাচল একরকম প্রায় থেমে এসেছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা মোটরকার এদিক থেকে সেদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে।

রাস্তার দু'পাশে গাড়িগুলো নিঝুম পুরীর মত ঝিমিয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। দু'একজন কচিৎ পথ চলছে।

এমন সময় একটি শব্দবিহীন মোটরকার এসে থামল চৌধুরী বাড়ির গেটে।

পাহারাদার বারান্দায় বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। গাড়ির শব্দ পেয়ে পাহারাদার সজাগ হয়ে উঠল, ছুটে এলো সে। এতরাতে গাড়ি এলো কোথা হতে।

দারোয়ান কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই গাড়ির চালক একটি কার্ড বের করে দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলল—বিবি সাহেবকে ডেকে দাও।

তিনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘুমাননি, তুমি যাও।

দারোয়ান বলল– তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাছাড়া তিনি এত রাতে কারও সঙ্গে দেখা করেন না। দারোয়ান জোর গলায় কথাটা বলে উঠে।

যাবে না তুমি?

না।

তবে গেট খুলে দাও।

হুকুম নেই। গেট আমি খুলব না।

বেশ। চালক ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ায় গাড়ির দিকে। দারোয়ানও ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় অমনি চালক পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরে, তারপর মুখের মধ্যে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে টেনে তুলে ফেলে গাড়ির মধ্যে।

দারোয়ানের হাতে ছিল গুলিভরা বন্দুক, তবু সে একটু নড়তে পারল না বা টু শব্দ করতে সক্ষম হলো না। চালক ওকে একটা দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে গাড়ির মেঝেতে শুইয়ে রাখল, তারপর দারোয়ানের পকেট থেকে গেটের চাবি নিয়ে গেট খুলে ফেলল।

গাড়ি-বারান্দায়, গাড়ি রেখে চালক নেমে পড়লো। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে। পাহারাদার এবং চাকর-বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শোকাতুরা মরিয়ম বেগম কেঁদে কেঁদে এখন মৃতের ন্যায় অসাড় হয়ে পড়েছেন। শিয়রে বসে মনিরা তখনও জেগে নীরবে চোখের পানি ফেলেছে। কতদিনের কত কথা আর কত স্মৃতি মনে উদয় হচ্ছে। পিতৃসমতুল্য চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু তাঁর সমস্ত হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সংসারে আপনজন বলতে তার ঐ মামুজান আর মামীমা ছাড়া আর কেউ নেই।

যতই মনিরা চৌধুরী সাহেবের কথা স্মরণ করছে, ততই ব্যথায় মুষড়ে পড়ছে। দু'চোখে পানি আজ বাঁধভাঙা স্রোতের মত হু হু করে নেমে আসছে। অথৈ সাগরে ভেসে চলেছে ওরা। মনিরা মামীমার চুলে হাত বুলিয়ে নীরবে কাঁদছিল।

হঠাৎ কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করতেই চমকে মুখ তুলল মনিরা। এতো দুঃখ আর ব্যথার মধ্যেও চোখ দুটো তার উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল— এসেছ। এতোক্ষণে এসেছ তুমি...বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো মনিরার কণ্ঠ।

দস্যু বনহুররের চোখে আজ অশ্রু। একটু পূর্বে বনহুরই শব্দবিহীন গাড়ি নিয়ে চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশ করেছিল।

মনিরার কথায় কোন জবাব দিতে পারে না, বনহুর। শুধু ঠোঁট দু'খানা একটু কেঁপে উঠে।

মনিরা ডাকে—মামীমা উঠো, দেখ কে এসেছে!

মরিয়ম বেগম তন্দ্রাচ্ছন্নভাব মুহূর্তে ছুটে যায়। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকান তিনি।

মনিরকে এখন চিনতে তাঁর দেরী হয় না। কারণ, ইতোপূর্বে মাতা-পুত্রের মিলন ঘটেছিল।

মরিয়ম বেগম পুত্রের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠেন। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেংগে পড়ে বলেন— ওরে আজ তুই এলি? তোর আব্বা যে আর এ দুনিয়ায় নেই। কাকে দেখতে এলি তুই! ওরে কাকে দেখতে এলি......

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে বনহুর—আম্মা!

মনির, তোর আব্বার তুই যে ছিলি নয়নের মনি। হৃদয়ের ধন ......

আম্মা আমি পারলাম না তার একটু সেবা করতে, আমার জন্য তিনি জীবনে শুধু অশান্তিই ভোগ করে গেলেন। আমি তাঁর কিছু করতে পারলাম না আম্মা; আব্বার আত্মা আমাকে অভিসম্পাত করবে চিরদিন, আমি সে অভিসম্পাত আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবো......

না না, তোকে তিনি অভিসম্পাত করতে পারবেন না। তিনি যে তোকে বড় ভালবাসতেন! ওরে, তিনি যে তোকে বড় ভালবাসতেন!

আম্মা!

আমার ! বাবা মনির-

ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে দ্রুত জুতোর শব্দ শুনা যায়।

বনহুর হঠাৎ চমকে উঠে।

মনিরাও সচকিত হয়ে বলে উঠে—এতোরাতে কারা এলো?

দরজার পাশে গিয়ে সিঁড়ির দিকে উঁকি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বলে- মনির, পুলিশ।

মরিয়ম বেগম হতভম্ভের মত বলেন—পুলিশ!

বনহুর একবার মা আর মনিরার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিছনের জানালা পথে পাইপ বেয়ে নেমে যায় নিচে।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ হারুন ও রায়, সঙ্গে মিঃ জাফরী। পিছনে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ।

মিঃ হারুন বিনীত কণ্ঠে বলে উঠেন— মাফ করবেন, যদিও আপনারা আজ অত্যন্ত শোকাতুরা তবু আপনাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। এখানে আপনার পুত্র দস্যু বনহুর এসেছে। বলুন সে কোথায়?

জবাব দেয় মনিরা—এসেছিল, কিন্তু এখন নেই।

মিস্ মনিরা অযথা মিথ্যা বলে...

না, আমি মিথ্যা বলিনি। .... আপনার আমাদের সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখতে পারেন।

মিঃ জাফরী পুলিশদের লক্ষ্য করে বলেন—তোমরা খুঁজে দেখো। তারপর মরিয়ম বেগমকে লক্ষ্য করে বলেন—দেখুন মিসেস চৌধুরী, আপনি আজ শোকাতুরা, আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের মোটেই উচিত নয়। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত করতে হচ্ছে। আপনার স্বামী এবং আপনি অতি মহান এবং মহৎজন, এ কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আপনাদের পুত্র দস্যু বনহুর অতি জঘন্য....।

না, সে জঘন্য নয়, ফুলের মত নিষ্পাপ। মরিয়ম বেগম দীপ্ত কণ্ঠে কথাটা বলেন?

মিঃ জাফরী হেসে উঠেন– মায়ের কাছে সন্তান ফুলের মতোই নিষ্পাপ হয়। মিসেস্ চৌধুরী—দস্যু বনহুর শুধু ডাকু নয়, সে নর হত্যাকারী।

না না, আমার মনির নরহত্যা করতে পারে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। না না, কিছুতেই না–

অসম্ভব! ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনি দস্যু বনহুরের নাম শুনেছেন। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে পুলিশের ডায়েরী থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু দস্যু বনহুরের অপর দিকটা কি তা হয়ত এখনও আপনার জানা হয়নি। কিন্তু সে হতে পারে—নরহত্যাও সে করতে পারে, কিন্তু তাই বলে সে এতোখানি হীন নয় যে, তার পিতাকে হত্যা করে তার ঐশ্বর্য হস্তগত করবে।

মিস্ মনিরা আপনি জানেন—চোর ডাকু কোনদিন সৎ বা মহৎ হতে পারে না। অর্থের লোভে তারা সব পারে।

না, সে লোভী নয়। পিতার ঐশ্বর্য তো দূরের কথা, সে কারও ঐশ্বর্য চায় না।

হেসে উঠেন মিঃ হারুন—তাহলে সে দস্যুবৃত্তি করে কেন?

সেটা তার নেশা— পেশা নয়। অর্থের লোভে বনহুর কোন নরহত্যা করে না।

কিন্তু তার ভাল দিকটা একবারও ভেবে দেখবেন না? ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনি এরি মধ্যে ভুলে গেছেন দেশবাসীর প্রতি তার কত বড় আত্মত্যাগ! কিছুদিন পূর্বে বিদেশীর কবলে দেশ যখন মুহূর্মুহূ আশঙ্কায় আশঙ্কিত, তখন দস্যু বনহুর কি আপনাদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো না?

ছিলে! এ দেশ রক্ষা না হলে তারও যে বিপদ ছিলো এ– ও ঠিক।

না, তার বিপদ এখনও যেমন, ঠিক তখনও তেমন থাকত। শুধু মাতৃভূমির আকুল আহ্বানে সে সাড়া না দিয়ে পারেনি। ছুটে গিয়েছিল সে রণাঙ্গনে প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে, সে দেশ আর দেশবাসীকে করেছিল

রক্ষা। আজ প্রতিটি দেশবাসীর কর্তব্য দস্যু বনহুরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

মিঃ জাফরী গর্জন করে উঠেন—মিঃ হারুন, একেও এরেস্ট করা দরকার। কেন এতোদিন আপনারা একে মুক্ত করে রেখেছেন?

মিঃ হারুন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন- উত্তেজনার বশে এসব বলছে স্যার। আসলে এদের কোন দোষ নেই। চৌধুরী সাহেব অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। ওনার স্ত্রী মিসেস চৌধুরীও তেমনি অতি ভদ্র এবং নম্র। এ মেয়েটি অবশ্য একটু উগ্র স্বভাব, কিন্তু আসলে কিছু নয়। আমাদের অন্যভাবে এসব অনুসন্ধান নিতে হবে..।

ওদিকে পুলিশগণ সমস্ত কক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরে এলো—না স্যার, কোথাও কেউ নেই।

মিঃ হারুন নিজেও একবার খুঁজে দেখলেন, কিন্তু তাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হল।

মিঃ জাফরী কিন্তু মনে মনে ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন, গর্জন করে বললেন- অযথা আপনি না জেনে এভাবে এলেন কেন?

না স্যার, দস্যু বনহুর যে এখানে এসেছিল এ কথা সত্য। কারণ গেটের বাইরে যে গাড়িখানা আমরা দেখলাম, সেটাই দস্যু বনহুরের গাড়ি এবং বন্দী দারোয়ান যা বলল তাতেও ঐ রকমই বুঝা যায়।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন ও পুলিশগণ মিলে যখন ফিরে চললেন, তখন ভোরের আলোতে পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

❑

পুলিশ অফিসে পাশাপাশি বসে আলাপ করছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

মিঃ হারুন বলেন—স্যার, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের পূর্বে আমাদের কর্তব্য চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদঘাটন করা।

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছাও তাই। আপনি এ ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু করুন। কেসটা অত্যন্ত জটিল এবং ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে।

ইয়েস স্যার, চৌধুরী সাহেবের হত্যার পিছনে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

সে রহস্যই উদঘাটন করতে হবে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন ভগবৎ সিং।

মিঃ হারুন ভগবৎ সিংকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। যতক্ষণ না আসল খুনী ধরা পড়ছে ততক্ষণ তো কারো উপরে অসৎ ব্যবহার করা চলে না।

হ্যাণ্ডশেক করার জন্য মিঃ জাফরীর দিকে হাত বাড়ালেন ভগবৎ সিং।

মিঃ জাফরী হাত তুলে একটু আদাব জানালেন মাত্র।

ভগবৎ সিং আসন গ্রহণ করে বলেন—দেখুন ইনসপেক্টর সাহেব, কাল থেকে আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই। কারণ, চৌধুরী সাহেব আমার বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন। একটু থেমে পুনরায় বলেন—যতক্ষণ না এ হত্যারহস্য প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ আমার এ অশান্তি যাবে না।

মিঃ হারুনই জবাব দেন—আমরা হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা নিচ্ছি।

মাথা চুলকে বলেন ভগবৎ সিং—ভয় হয় আমার ঘাড়ে না আবার কোন দোষ চেপে বসে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সিং বাহাদুর। আমরা নির্দোষীর ঘাড়ে কোন সময় দোষ চাপাবো না। মিঃ হারুন মৃদু হেসে কথাটা বলেন।

মিঃ জাফরী গভীর কণ্ঠে বলে উঠেন—আপনার বাড়িতে যখন হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে, তখন আপনাকে একটু কষ্ট ভোগ করতে হবে বৈকি। তাছাড়া যতক্ষণ আসল হত্যাকারী আবিষ্কার না হয়েছে ততক্ষণ আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পারছেন না।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সত্যিকার বলছি ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি এ হত্যার ব্যাপারে একেবারে কিছুই জানি না।

মিঃ হারুন বলে উঠলেন—না না, আপনি তেমন লোক নন। আপনার মহৎ ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

হেঁ হেঁ, আপনারাই তো আমার আপন জন। আমার ঘরের খবর পর্যন্ত আপনারা জানেন।

মিঃ হারুন মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন– স্যার, এনার কথা একেবারে সত্য। ইনি আজীবন অবিবাহিত। বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক নেই। তাছাড়া ইনি বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেশেনও কম। দু'চারজন চাকর-বাকর ছাড়া....

এসব আমি এখন শুনতে চাইনি মিঃ হারুন। আচ্ছা সিং বাহাদুর আপনি এখন আসুন। গম্ভীর গলায় বলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন একটু বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু তাঁর উপরওয়ালার কথায় তো কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। কাজেই নীরব রইলেন।

ভগবৎ সিং উঠে দাঁড়ালেন—আমি তাহলে চলি। নমস্কার। বেরিয়ে যান ভগবৎ সিং।

ভগবৎ সিং বেরিয়ে যেতে মিঃ জাফরী বলেন—দেখুন মিঃ হারুন, আপনি তাকে যতখানি মহৎ এবং ভদ্র বলে মনে করছেন, ঠিক ততখানি নাও হতে পারে। একটু থেমে পুনরায় বলেন—ভগবৎ সিং এর উপর কড়া নজর রাখবেন। লোকটার ব্যবহার যদিও মন্দ নয়, তবু আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। হয়তো আমার এ সন্দেহ মনের এক ভ্রম, তাও হতে পারে। যাক্, এবার শুনুন, এখন আমরা কিভাবে কাজে নামবো এ নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

ইয়েস্ স্যার। কিন্তু আমাদের এ আলোচনার সময় মিঃ রায় এবং মিঃ আলমের সেখানে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। সন্ধ্যার পূর্বে আমরা অফিস-রুমে আলোচনা বৈঠকে বসব। আপনি মিঃ শঙ্কর রাও এবং আলমকে জানিয়ে দিন।

আচ্ছা স্যার, দিচ্ছি!

তখনকার মত মিঃ জাফরী উঠে পড়েন।

মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

মিঃ হারুন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরীকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

ডাকবাংলায় মিঃ জাফরীর অফিস রুম।

চৌধুরী সাহেবের হত্যা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিল। মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আরও ছিলেন মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম।

আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ কেসের দায়িত্বভার মিঃ জাফরী নিজে গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে থাকবেন মিঃ হারুনও আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। আর রয়েছেন মিঃ রাও এবং মিঃ আলম, এরা চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশকে সহায়তা করবেন।

মিঃ আলম অবশ্য পুলিশ ডিটেকটিব নন। তিনি সখের গোয়েন্দা। সখ করে তিনি এসেছেন এ কাজে। ধনবান জাকারিয়া সাহেবের একমাত্র সন্তান তিনি।

শহরে বিরাট বাড়ি-গাড়ি সব আছে তাঁর। কাজেই এসব ব্যাপারে তার কোনই অসুবিধা হবে না।

সবাই যখন এই হত্যারহস্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন মিঃ আলম একপাশে নিশ্চুপ বসে বসে তাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। সকলের মুখোভার প্রসন্ন হলেও মিঃ আলমের মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর এবং ভাবাপন্ন। চৌধুরী সাহেবের হত্যা-ব্যাপার নিয়েই তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন।

সেদিনের মত আলোচনা শেষ হয়।

বিদায় গ্রহণ করেন মিঃ আলম এবং শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন এবং পুলিশ অফিসার দু'জনও সেদিনের মত মিঃ জাফরীর নিকটে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য নিয়ে জোর তদন্ত শুরু হল। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন প্রকাশ্য অনুসন্ধান করে চালালেন। মিঃ শঙ্কর রাও আর মি আলম গোপনে অনুসন্ধান করে চললেন।

সেদিন পার্টিতে চৌধুরী সাহেবের টেবিলে বসে কে কে খাচ্ছিলেন, এটা নিয়েও গভীরভাবে আলোচনা চলল। সেদিন তাঁর টেবিলে ছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, খান বাহাদুর হালিম সাহেব, ডাঃ জয়ন্ত সেন এবং মিঃ আলম।

মিঃ জাফরীর ধারণা এ ক'জনার মধ্যে যে কোন একজন চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কে সে ব্যক্তি এবং কি তার উদ্দেশ্য?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ খুঁজে পেল না।

পুলিশ মহলে যখন চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে তখন একদিন...

গভীর রাত!

ডাক্তার জয়ন্ত সেন নিজের কক্ষে শুয়ে ছটফট করছেন। মনে যেন এতটুকু শান্তি পাচ্ছেন না! একবার উঠছেন একবার বসছেন আবার দরজা খুলে ছাদে গিয়ে পায়চারি করছেন।

অন্ধকার রাত। খোলা ছাদে রেলিং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ান জয়ন্ত সেন। হঠাৎ পিঠে একটা ঠাণ্ডা শক্ত জিনিসের স্পর্শ অনুভব করলেন।

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখতেই ডাক্তার সেনের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে এলো।

দেখলেন অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পিছনে— হাতে রিভলভার।

ছায়ামূর্তি চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল– চিৎকার কর না।

তুমি কে?

আমি যমদূত।

কি চাও তুমি আমার কাছে?

তোমার জীবন।

এ্যাঁ, কি বলছ? টাকা নেবে? যত টাকা চাও দেব।

ছায়ামূর্তি কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠে— যম কোনো দিন টাকার লোভী নয়। শয়তান, অনেক দিন পূর্বেই আমি তোমাকে খতম করতে পারতাম, কিন্তু করিনি– এটা তোমার বরাৎ। আজ আর তুমি আমার হাতে রক্ষা পাবে না।

কেন, কি করেছি আমি তোমার?

একজন মহৎ ব্যক্তিকে তুমি হত্যা করেছ।

না না আমি কাউকে হত্যা করিনি...

ছায়ামূর্তি জয়ন্ত সেনের গলায় চেপে ধরেন— তুমি চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ দাওনি?

আমি— আমি নাতো। এসব তুমি কি বলছ?

ন্যাকামি করো না। শীঘ্র বল কোন সময় তুমি তার খাবারে বিষ দিয়েছিলে? সাবধান, মিথ্যা বল না।

ডাক্তার জয়ন্ত সেনের চোখ ছানাবড়া হয়। মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। একবার ছায়ামূর্তির দক্ষিণ হস্তস্থিত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বলেন—আমার কোন দোষ নেই, ঐ–ঐ ভগবৎ সিং বিষ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল আমাকে।

তাই তুমি একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে? উঃ, এত বড় পাষণ্ড তুমি! পরক্ষণেই ছায়ামূর্তি ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে ভূতলশায়ী করে টুটি টিপে ধরল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। ডাক্তার সেনের কণ্ঠ দিয়ে একরকম গড় গড় শব্দ বেরিয়ে এলো। চোখ দুটো ডিমের মত গোলাকার হয়ে উঠল। জিভটা ঝুলে পড়ল এক পাশে। শরীরটা বার দুই ঝাকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি পাশে রাখা রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর সিড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল নিচে।

হঠাৎ জয়ন্ত সেনের দারোয়ান ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল— চোর, চোর! কিন্তু ছায়ামূর্তি তখন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে।

❑

রাত শেষ প্রহর।

গোটা রাত অনিদ্রার পর ভগবৎ সিং কেবলমাত্র চাদরটা চোখেমুখে টেনে নিয়ে সুখনিদ্রার আয়োজন করছিলেন। এমন সময় জানালার শার্সী খুলে কক্ষমধ্যে লাফিয়ে পড়ল পূর্বের সেই ছায়ামূর্তি।

ভগবৎ সিং বদ্ধ কক্ষে অকস্মাৎ শব্দ পেয়ে চাদর সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেন। ততক্ষণে ছায়ামূর্তি তাঁর নিকটে পৌঁছে গেছে।

ভগবৎ সিং চিৎকার করবার পূর্বেই একটি সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বের করে তাঁর বুকে চেপে ধরে ছায়ামূর্তি, তারপর চাপা গর্জন করে উঠে— খবরদার! চেঁচাবে না।

ভগবৎ সিং একবার বক্ষসংলগ্ন ছোরাখানার ডগায় তাকিয়ে তাকান ছায়ামূর্তির মুখে। কঠিন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠে তাঁর মুখটা। বাম পাশের ঠোঁটখানা উপরের দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বলেন- কে তুমি?

আজরাইল। তোমার জান নিতে এসেছি।

আমার জান নেবে তুমি? কেন, আমি তোমার কি অন্যায় করেছি?

যা করছে, অতি জঘন্য।

ভগবৎ সিং কোনোদিন কারো অন্যায় করেনি বা করে না।

বিড়াল তপসী সেজে সকলের চোখে ধুলো দিলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারনি শয়তান। কেউ না চিনলেও আমি তোমায় চিনেছি। এবার আর তোমার নিস্তার নেই। তোমার জান আমি কবচ করে ছাড়বো।

কে– কে তুমি?

এই মুহূর্তে আমি কে টের পাবে। চৌধুরী সাহেবকে হত্যার পরিণতি কি এখনই বুঝতে পারবে শয়তান।

চৌধুরী হত্যার পরিণতি... না না, চৌধুরী হত্যা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

তুমি তাকে হত্যা করিয়েছ।

এ কথা তুমি কেমন করে জানলে?

সেদিনের পার্টিতে আমিও ছিলাম।

তুমি— তুমি ছিলে সেদিন আমার পার্টিতে..... কে তুমি?

ভগবৎ সিং- এর কথা শেষ হয় না, ছায়ামূর্তির হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হয় ভগবৎ সিং এর বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে বিছানার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন ভগবৎ সিং। দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল।

ছায়ামূর্তি একটানে ভগবৎ সিং-এর বুক থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে জানালাপথে অদৃশ্য হল।

ঠিক সেইক্ষণে ভগবৎ সিং-এর এক কর্মচারী ছুটে আসে সেখানে। সে দেখতে পায় একটি ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিশে গেল। বিছানায় তাকিয়ে চক্ষুস্থির, একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সে– খুন– খুন–

পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো গোটা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। এক রাতে জোড়া খুন। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের অদ্ভুত মৃত্যু এবং বণিক ভগবৎ সিং এর রহস্যময় হত্যা– কিন্তু এ খুন করল কে?

পরবর্তী বই

ছায়ামূর্তি

ছায়ামূর্তি-৬

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

পরদিন ভোর হবার সংগে সংগে পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেল। একরাতে জোড়া খুন। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের অদ্ভুত মৃত্যু এবং বণিক ভগবৎ সিংয়ের রহস্যময় হত্যা গোটা শহরে একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। আগের দিনই চৌধুরী সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যু শহরবাসীকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। পর পর দু'দিনে তিনটি খুন সবাইকে ভাবিয়ে তুলল।

মিঃ জাফরী নিজে গেলেন এই খুনের তদন্তে। সংগে মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম রয়েছেন। আর রয়েছেন কয়েকজন পুলিশ।

ডাক্তার সেনের বাড়িতে পৌঁছতেই তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন উদভ্রান্তের মত ছুটে এলেন, মিঃ হারুনকে তিনি চিনতেন, তাঁর হাত ধরে একেবারে কেঁদে পড়লেন— আমার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিন ইন্সপেক্টার সাহেব! শাস্তি দিন।

মিঃ হারুন সান্ত্বনার স্বরে বললেন— আপনি শান্ত হোন মিঃ সেন, আপনার পিতার হত্যাকারীকে আমরা খুঁজে বের করবোই এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে------

মিঃ জাফরী লাশ তদন্ত করে আশ্চর্য হলেন। খোলা ছাদে তাঁকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হলেন—গভীর রাতে ডাক্তার জয়ন্ত সেন ছাদে কেন এসেছিলেন? তাঁকে জোর করে এখানে আনা হয়েছিল না তিনি নিজেই এসেছিলেন? ডাক্তার জয়ন্ত সেনের শোবার ঘর পরীক্ষা করে দেখলেন, ঘরের একটা জিনিসও এদিক-সেদিক হয়নি। এমনকি বিছানাটাও এলোমেলো হয়নি।

ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হত্যাকারী যে শুধু তাঁকে হত্যা করতেই এসেছিল এটা সত্য। কেননা টাকা-পয়সা বা কোনো জিনিসপত্র চুরি যায়নি।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করেও পুলিশ অফিসারগণ এ হত্যারহস্যের কোনো কিনারায় পৌঁছতে সক্ষম হলেন না।

মিঃ জাফরী পরীক্ষাকার্য শেষ করে ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হলঘরে গিয়ে বসলেন। তিনি হেমন্ত সেনকে লক্ষ্য করে বললেন—আমি আপনাদের বাড়ির সবাইকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

হেমন্ত সেন উত্তর দিলেন—করুন।

হেমন্ত সেনের বাড়িতে তেমন বেশি লোকজন ছিল না। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের স্ত্রী অনেকদিন আগে মারা গেছেন। একমাত্র পুত্র হেমন্ত সেন, তাঁর স্ত্রী নমিতা দেবী আর শিশু পুত্র কুন্তল। ড্রাইভার রজত এবং দারোয়ান গুরু সিং— মোটামুটি এই নিয়ে ডাক্তার সেনের সংসার। আর ছিলেন ডাক্তার জয়ন্ত সেনের কম্পাউন্ডার নিমাই বাবু।

সবাইকে হলঘরে ডাকলেন হেমন্ত সেন।

মিঃ জাফরী নিজে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি হেমন্ত সেনকেই প্রশ্ন করলেন— আপনার বাবার হত্যা ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন হেমন্তবাবু?

কিছুই না। আমার বাবার হত্যা ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

কাল রাতে আপনার বাবা কখন শোবার ঘরে গিয়েছিলেন, বলতে পারেন নিশ্চয়ই?

না স্যার। কারণ আমি কাল অনেক রাতে বাসায় ফিরেছি।

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে। আমি সেখান থেকে যখন ফিরে আসি তখন বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছিল কিন্তু আমি তখনও বাবার ঘরে আলো দেখেছি। আমার মনে হল বাবা তখনও ঘুমোননি।

আপনি এরপর কতক্ষণ জেগেছিলেন?

বেশি সময় জাগতে পারিনি। কারণ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরে সারা দিনের ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি।

রাতে কোন শব্দ পাননি? কোনোরকম গোঙানি বা আর্তচিৎকার?

না। তবে আমাদের দারোয়ান গুরু সিং ছাদের সিঁড়ি বেয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে নেমে যেতে দেখেছে।

আচ্ছা, আপনার স্ত্রীকে আমি এবার প্রশ্ন করব।

বেশ, করুন।

আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল নমিতা দেবী, এগিয়ে এলো।

মিঃ জাফরী তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনার শ্বশুর ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হত্যা সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

না। তাঁর হত্যা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে এটুকু জানি, আমার শ্বশুর গত দু'দিন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁকে সব সময় খুব উদ্বিগ্ন মনে হত। নমিতা দেবী স্বচ্ছ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কয়টি বলে গেল।

পুলিশ অফিসাররা নিশ্চুপ সব শুনে যাচ্ছিলেন। একপাশে মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম বসে রয়েছেন।

নমিতা দেবীর কথায় মিঃ আলমের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটোও কেমন যেন ধক করে জ্বলে ওঠে নিভে গেল।

আর কেউ মিঃ আলমের মুখোভাব লক্ষ্য না করলেও মিঃ জাফরী লক্ষ্য করলেন। তিনি মিঃ আলমকে লক্ষ্য করে বললেন— মিঃ আলম, আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার জয়ন্ত সেন তাঁর নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলেন?

না ইন্সপেক্টর সাহেব, ডক্টর সেন তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই টের পাননি। তিনি এমন কোন কাজ করে বসেছিলেন— যে কাজের জন্য তিনি শুধু উদ্বিগ্ন না, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মিঃ আলম গম্ভীর শান্তকণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

মিঃ হারুন বললেন— মিঃ আলমের চিন্তাধারা নির্ঘাৎ সত্যি। নমিতা দেবীর কথায় সেরকমই মনে হয়।

মিঃ জাফরী ড্রাইভার রজত এবং কম্পাউন্ডার নিমাই বাবুকে প্রশ্ন করে তেমন কোনো সন্তোষজনক জবাব পেলেন না। দারোয়ান গুরু সিং এলো এবার মিঃ জাফরীর সম্মুখে। লম্বা সালাম ঠুকে দাঁড়াল এক পাশে।

মিঃ জাফরী জিজ্ঞাসা করলেন— তোমার নাম গুরু সিং?

হ্যাঁ হুজুর, আমার নাম গুরু সিং। আমিই তো দেখেছি হুজুর।

কি দেখেছ? প্রশ্ন করলেন মিঃ জাফরী।

সেই ছায়ামূর্তি হুজুর।

ছায়ামূর্তি?

হ্যাঁ হুজুর, যে ডাক্তারবাবুকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

ধমকে ওঠেন মিঃ হারুন— তুমি কি করে জানলে সেই ছায়ামূর্তি ডাক্তার বাবুকে হত্যা করেছে?

সেই ছায়ামূর্তি ছাড়া কেউ ডাক্তারবাবুকে হত্যা করেনি হুজুর, একথা আমি ঠাকুর দেবতার দিব্য করে বলতে পারি।

মিঃ জাফরী বললেন— তুমি তখন কোথায় ছিলে?

হুজুর গেটের পাশের খুপড়িতে। গভীর রাতে হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি নেমে আসছে। আমি চিৎকার করে উঠি—চোর—চোর কিন্তু হুজুর আশ্চর্য! ছায়ামূর্তি কোথায় যেন হাওয়ায় মিশে গেল। আমার চিৎকারে কারও ঘুম ভাঙলো না। আমি তখন কাউকে না ডেকে নিজেই উপরে উঠে গেলাম। ঘুরেফিরে দেখলাম সব দরজা বন্ধ রয়েছে। এমন কি ডাক্তারবাবুর

ঘরের দরজাও বন্ধ। তখন নিশ্চিন্ত মনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। তারপর একটু শুয়ে পড়েছি। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি হুজুর, ভোরে চাকর ছোকরাটার ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো, শুনলাম সে ভয়ার্ত গলায় বলছে, গুরু সিং, গুরু সিং, ডাক্তারবাবু খুন হয়েছেন, ডাক্তারবাবু খুন হয়েছেন। আমি চোখ রগড়াতে রগড়াতে ছুটলাম উপরে। তারপর গিয়ে দেখি— ডাক্তারবাবু ছাদে পড়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কান্না কাটি শুরু করেছে।

যাক, আর তোমাকে বলতে হবে না। ডাক্তারবাবু হত্যা সম্বন্ধে এ বাড়ির সকলের চাইতে তুমিই বেশি জান দেখছি। তারপর মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী বললেন— একেও থানায় নিয়ে চলুন। কয়েক ঘা খেলেই দোষ আছে কিনা বেরিয়ে পড়বে। এ নিশ্চয়ই ডাক্তার সেনের হত্যা সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে।

হেমন্ত সেনের কথাও শুনলেন না মিঃ জাফরী, দারোয়ান গুরু সিংয়ের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হল।

এবার মিঃ জাফরী দলবলসহ চললেন বণিক ভগবৎ সিংয়ের বাড়িতে। ভগবৎ সিংয়ের বাড়িতে পৌছে অবাক হলেন মিঃ জাফরী। এত বড় বাড়িতে মাত্র ক'জন লোক। একজন মহিলা দাসী, একজন চাকর। এছাড়া একজন বয়স্ক লোক, তিনি নাকি ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় হন।

ভগবৎ সিং খুন হয়েছেন তাঁর শোবার ঘরে। বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ভগবৎ সিং। জমাট রক্তে বিছানার কিছুটা অংশ কালো হয়ে উঠেছে। কতগুলো মাছি বন বন করে উড়ছিল সেখানে। একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা অমূল বিদ্ধ হয়ে আছে ভগবৎ সিংয়ের বুকে।

গতকালই যে ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে এত মহৎ ব্যবহার করেছেন—আর আজ তাঁর এ অবস্থা। পুলিশ অফিসার হলেও হৃদয় তো একটা ব্যথায় ছোঁয়া লাগল সকলের মনে।

মিঃ জাফরী নিজ হাতে ভগবৎ সিংয়ের বুক থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিলেন। তারপর স্তব্ধকণ্ঠে বললেন— অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড। হত্যার হিড়িক পড়ে গেছে যেন।

মিঃ হারুন বলেন— এ তিনটা হত্যাকাণ্ডই অত্যন্ত রহস্যময়। মিঃ চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা, ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে গলা টিপে মেরে ফেলা— আর ভগবৎ সিংকে ছোরাবিদ্ধ করা।

মিঃ শঙ্কর রাও গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। তিনি বললেন এবার— এ তিন ব্যক্তির হত্যাকারী এক। যদিও বিভিন্ন রূপে এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে।

মিঃ আলম একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বলেন এ তিন ব্যক্তির হত্যাকারী এক নাও হতে পারে, কিন্তু এ তিন ব্যক্তির হত্যারহস্যের যোগসূত্র এক বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী তাকালেন মিঃ আলমের মুখের দিকে, শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ থেকে— হুঁ!

মিঃ জাফরী লাশ পরীক্ষা করা শেষ করে ডাকলেন ভগবৎ সিংয়ের বাড়ির তিন ব্যক্তিকে। প্রথমে তিনি ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক ভগবৎ সিংয়ের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলেন না।

দাসীও জানাল কিছু জানে না এ ব্যাপারে সে।

কিন্তু চাকর রঘু বলল—সাহেব, আমি কাল রাতে যখন ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ একটা অর্তনাদে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার মনে হল মালিকের ঘর থেকেই শব্দটা আসছে। আমি একটুও দেরী না করে ছুটলাম মালিকের ঘরের দিকে। কিন্তু ঘরের দরজায় পৌছে দেখলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি ছুটে গেলাম ওদিকের জানালার ধারে ভাবলাম, ঐদিক দিয়ে মালিকের ঘরের মধ্যে কেউ ঢুকলে দেখতে পাব —কিন্তু সাহেব, কি দেখলাম— এখনও ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে, আমি যেমনি জানালার পাশে এসে ভিতরে উঁকি দিতে যাব, অমনি ঘরের ভিতর থেকে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুই কি করলি? প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

আমি কি করব, থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করতে লাগল। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হুঁশ হল। তখন ঘরের ভিতরে কোন শব্দ হচ্ছে না, আমি জানালা দিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম। ঘরে আলো জ্বলছিল। সাহেব, যা দেখলাম— কি আর বলব মালিক বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা বিছানাটা। আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললাম, তারপর চিৎকার করে ছুটে গেলাম ওনার ঘরে--রঘু আঙ্গুল দিয়ে ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দিল। তারপর আবার বলতে শুরু করল— গিয়ে দেখি উনি ঘরে নেই--

ঘরে নেই। অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন মিঃ জাফরী। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন ভদ্রলোকটার দিকে— ওর কথা সত্য? আপনি তখন ঘরে ছিলেন না?

ভদ্রলোকের দাড়িগোঁফ ঢাকা মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয় কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন তিনি— বড্ড গরম লাগছিল তাই একটু খোলা ছাদে গিয়েছিলাম--

খোলা ছাদে গিয়েছিলেন, অথচ একটু আগে বললেন, আপনি নাকি এ হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। গম্ভীর কণ্ঠস্বর মিঃ জাফরীর।

এখনও বলছি আমি এ হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কারণ নিচের কোন শব্দই উপরে পৌঁছে না।

তাহলে কখন আপনি নিচে নেমে আসেন এবং ভগবৎ সিংয়ের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন? প্রশ্ন করলেন মিঃ জাফরী।

ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন—আমি নিজের ঘরে এসে যখন বিছানায় শুতে যাব, সেই সময় রঘুর চিৎকার আমার কানে যায়।

তার পূর্বে আপনি রঘুর চিৎকার শুনতে পাননি?

না, অবশ্য তার আর একটা কারণ ছিল।

বলুন?

রঘু আমাকে ঘরে না দেখে বাইরের লোকজনকে ডাকতে গিয়েছিল। পথের দু'চারজন লোককে নিয়ে রঘু এসে আবার চিৎকার করতে শুরু করে দিল তখন আমি শুনতে পাই।

গম্ভীর কণ্ঠে শব্দ করলেন— মিঃ জাফরী -হুঁ। আশ্চর্য বটে, টের পেলেন না।

সত্যি বলছি এমন একটা কিছু ঘটবে আমি ধারণা করতে পারিনি।

আপনার নামটা যেন কি বলেছিলেন? আমি ভুলে গেছি। জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ জাফরী।

কক্ষে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শুধু মিঃ জাফরী প্রশ্ন করে চলেছেন।

ভদ্রলোক বললেন— আমার নাম জয় সিং।

এবার মিঃ জাফরী দাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমিও তো কিছুই জান না। কিন্তু তুমি ঠিক ভগবৎ সিংয়ের পাশের ঘরেই ঘুমিয়েছিলে, তাইনা?

তা ছিলাম। বুড়ো মানুষ সারাটা দিন খেটেখুটে শুয়েছি, অমনি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই হুজুর, আমি মালিকের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। মালিক বড় ভাল লোক ছিলেন হুজুর। তিনি আমার মা বাপ। কাঁদতে শুরু করে দাসী। একবার তাকায় জয় সিংয়ের মুখের দিকে।

হঠাৎ শঙ্কর রাও বললেন —একে যেন আমি কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। গলার স্বরটাও যেন শুনেছি।

বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে বলে— তা দেখবেন হুজুর, আমি সব সময় লোকের বাড়িতে কাজ করি না।

মিঃ আলম এবার কথা বললেন— মিঃ রাও, আপনি ভাল করে স্মরণ করে দেখুন ওকে কোথায় দেখেছিলেন?

ঠিক মনে পড়ছে না।

গভীরভাবে চিন্তা করুন।

মিঃ রাও বুড়ীর মুখের দিকে তাকালেন, বুড়ী মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

মিঃ আলম কঠিন কণ্ঠে বললেন— এই দিকে মুখ করে দাঁড়াও।

তারপর মিঃ জাফরকে লক্ষ্য করে বললেন— স্যার, একে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

মিঃ জাফরী বলেন স্বচ্ছন্দে করুন মিঃ আলম।

মিঃ আলম এবার বুড়ীকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—তোমার নাম কি?

আমার নাম, আমার নাম তো তেমন কিছুই নেই। সবাই আমাকে 'মাসী' বলে ডাকে।

তা ডাকুক, তোমার নাম শুনতে চাচ্ছি?

নাম··এবার বুড়ী তাকালো জয় সিংয়ের মুখে, উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। বুড়ী আবার ঢোক গিলে বলল— আমাকে ছোটবেলায় সবাই 'সই' বলে ডাকত।

গর্জে উঠলেন মিঃ আলম— মিথ্যে কথা! তোমার সঠিক নাম শুনতে চাই।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার মিঃ আলমের বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন। তাঁরা সবাই তাকালেন মিঃ আলমের মুখের দিকে।

মিঃ আলমের সুন্দর মুখমণ্ডল রাগে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দুটিতে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন— জান মিথ্যার শাস্তি কি? এ মুহূর্তে আমি তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

বুড়ীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে একবার তাকাচ্ছে সে জয়সিংয়ের দিকে, আর একবার তাকাচ্ছে মিঃ আলমের চোখ দুটোর দিকে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা বারবার চেটে নিচ্ছে।

বুড়ীর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, ওর মনের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মিঃ আলমের মুখোভাব লক্ষ্য করে বুড়ী শিউরে ওঠে কম্পিত কণ্ঠে বলে— আমার নাম সতী দেবী ···

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি—তুমিই সেই সতী দেবী, যাকে দস্যু নাথুরামের ওখানে দেখেছিলাম। সেই সতী দেবী তুমি ---- এখানে কেন --- এখানে কেন তুমি? শঙ্কর রাও এবার বুড়ীর ওপর রেগে ফেটে পড়লেন।

কক্ষের সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন। মিঃ জাফরীর দু'চোখেও বিস্ময়।

মিঃ হারুনের মুখোভাব কঠিন হয়ে উঠেছে।

মিঃ আলমের মুখমণ্ডল পূর্বের চেয়ে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তিনি মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বললেন— এই স্মরণশক্তি নিয়ে আপনি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন!

মিঃ আলম যদিও তাঁর বন্ধুলোক তবুও তাঁর কথায় লজ্জিত হলেন মিঃ রাও।

মিঃ আলম মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন— স্যার, আমি জয়সিংকে অ্যারেস্ট করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমারও সেই মত।

মিঃ হারুন পুলিশকে ইঙ্গিত করলেন জয় সিংয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে।

সতী দেবীর হাতেও হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হল।

জয় সিং প্রায় কেঁদেই ফেললেন—আমাকে বিনা অপরাধে এভাবে অপমানিত করছেন কেন?

মিঃ আলম বললেন, তার জবাব পাবেন বিচারের পরে। এবার তিনি মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন— স্যার ,লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে একজন ক্যামেরাম্যানের আবশ্যক। ভগবৎ সিংয়ের ছবি রাখা দরকার।

মিঃ জাফরী অবাক হলেও মনোভাব প্রকাশ না করে ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

মৃত ভগবৎ সিংয়ের ফটো নেয়া হল। পর পর দুটো।

মিঃ আলম এবার মৃতের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন— আপনারা সবাই ভগবৎ সিংয়ের যে রূপ দেখতে পাচ্ছেন সেটা তার আসল চেহারা নয়।

কক্ষের সবাই অবাক হলেন। মিঃ জাফরী বললেন— কি বলছেন মিঃ আলম!

হ্যাঁ দেখুন। মিঃ আলম মৃত ভগবৎ সিংয়ের মুখ থেকে গোঁফ জোড়া খুলে নিলেন। কপালের ওপরের কিছুটা চুল টেনে তুলে ফেললেন।

মিঃ হারুন তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন এ যে ডাকু নাথুরাম। সর্বনাশ, আমরা এতদিনেও একে চিনতে পারিনি।

মিঃ জাফরী বললেন— এই সেই নাথুরাম? দস্যু নাথুরাম।

হ্যাঁ স্যার। আমাদের ডায়েরীতে এর নাম এবং ফটো আছে। বড় শয়তান— দুর্দান্ত ডাকু। কথাটা বললেন মিঃ হারুন।

শঙ্কর রাও যেন খুশি হলেন না। তিনি রাগে গস্ গস্ করে বললেন— বেটা আমাকে যা ভুগিয়েছিল। বেঁচে থাকলে আমি ওকে ফাঁসি দিয়ে, তবে ছাড়তাম।

মিঃ হারুন মিঃ আলমকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন— আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ আলম। ভগবৎ সিংয়ের আসল পরিচয় উদঘাটিত না হলে একটা জটিল রহস্য অন্ধকারের আড়ালে চাপা পড়ে যেত। ডাকু নাথুরামের ছদ্মাবেশে এবং তার এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আমরা কেউ জানতে সক্ষম হতাম না।

মিঃ জাফরীও মিঃ আলমের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল খুব প্রসন্ন বলে মনে হল না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— এই হত্যা রহস্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। জানি না এর সমাপ্তি কোথায়।

লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে নাথুরামের আরও দুখানা ফটো নেয়া হল।

মিঃ জাফরী দলবলসহ জয় সিং এবং সতী দেবীকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ অফিসে নিয়ে চললেন।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য আরও জটিল হয়ে উঠল।

বালিশে মুখ গুঁজে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল বনহুর। আজ ক'দিন থেকে একেবারে নীরব হয়ে পড়েছে সে। নিজ অনুচরদের সঙ্গে পর্যন্ত তেমন করে আর কথা বলে না।

হঠাৎ দস্যু বনহুরের হল কি?

অনুচরদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হল। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলার সাহস পেল না।

নূরীও কম বিস্মিত হয়নি, বনহুরকে সে এই প্রথম নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের বিশ্রামকক্ষে নিশ্চুপ শুয়েছিল বনহুর। নূরী ধীর পদক্ষেপে তার পাশে গিয়ে বসল। বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—হুর, কি হয়েছে তোমার ?

নূরীর কোমল স্পর্শে বনহুর মুখ তুলে তাকাল। দু'চোখে তার অশ্রুর বন্যা। নূরী নিজের আঁচল দিয়ে বনহুরের চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল হুর আমার কাছে কিছুই অজানা নেই। বলো, কি হল তোমার?

নূরী, কি বলব, আজ আমার মত দুঃখী কেউ নেই।

কি হয়েছে বল?

ছোটবেলায় আম্মা-আব্বার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁদের অপরিসীম আশীর্বাদ থেকে কোনোদিন বঞ্চিত হয়নি। আজ তাও হারিয়েছি। আমার ....আমার আব্বা আর বেঁচে নেই।

তোমার আব্বা! বিস্মিত কণ্ঠস্বর নূরীর।

হ্যাঁ, আমার আব্বা। নূরী তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী।

ছিঃ ও কথা বল না হুর। আমিই যে তোমার কাছে চির অপরাধী। কত মহৎ তুমি, তাই তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ..

শোনো নূরী, আমার আব্বা-আম্মা উভয়েই বেঁচে ছিলেন এতদিন।

বেঁচে ছিলেন?

হ্যাঁ নূরী।

কেন তবে যাওনি তুমি তাঁদের কাছে?

আমি তাঁদের অপরাধী সন্তান। আমি তাঁদের বংশের কলংক অভিশাপ। তাই সন্তান হয়েও পুত্রের দাবী নিয়ে কোনোদিন তাঁদের সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস পাইনি, পিতার মৃত্যুকালে বুক ফেটে গেছে, কিন্তু আব্বা বলে ডাকবার সুযোগ পাইনি; নূরী, আমি যে তাঁদের অভিশপ্ত সন্তান। ছোট্ট বালকের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বনহুর।

নূরীও কেঁদে ফেলে, বনহুরের চোখের পানি নূরীর হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। বনহুরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা যায়। নূরী উঠে দাঁড়িয়ে বলে—কে?

আমি মহসীন। দরজার বাইরে থেকে কথাটা ভেসে আসে।

নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে— হুর, মহসীন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। ওঠো।

বনহুর উঠে বসে। নূরী নিজের আঁচল দিয়ে বনহুরের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে— মহসীন তোমায় ডাকছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর— আসতে বল। নিজের চোখমুখ হাতের তালুতে ঘসে স্বাভাবিক করে নেয় সে।

মহসীন কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়।

বনহুর বলল— কাসেমের সন্ধান পেয়েছ?

না সর্দার। যারা ওর সন্ধানে গিয়েছিল, সবাই ফিরে এসেছে। সর্দার, আমার মনে হয় ও নেকলেসটার লোভ সামলাতে পারেনি। ফেরত দিতে গিয়ে আত্মসাৎ করে পালিয়েছে।

আমি তো জানি এত সাহস ওর হবে না।

সর্দার, তাহলে সে রয়েছে কোথায়?

ধরা পড়ে যায়নি তো?

না সর্দার। আমরা গোপনে সব জায়গায় সন্ধান নিয়ে দেখেছি।

এমন সময় রহমতের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়— সর্দার, কাসেম এসেছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে, বলল—নিয়ে এসো।

রহমতের পেছনে নতমুখে কাসেম এসে দাঁড়াল।

বনহুর নূরীকে বলল— নূরী, তুমি যাও, বিশ্রাম করোগে।

নূরী চলে গেল।

বনহুর অগ্নিদৃষ্টি মেলে তাকাল কাসেমের দিকে। কে মনে করবে এই সেই বনহুর, যে একটু পূর্বেই পিতৃশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। বনহুরের দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হয়। গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে ওঠে—কাসেম!

সর্দার!

খবর কি তোমার?

সর্দার ...

কোথায় গুম হয়েছিলে?

সর্দার, আমি নেকলেসখানা..

বল থামলে কেন?

সর্দার নেকলেস আমি ফেরত দিতে পারিনি।

তার মানে?

আমি তাকে খুঁজে পাইনি সর্দার।

খুঁজে পাওনি! তাই আত্মগোপন করে থাকতে চেয়েছিলে?

মাফ করবেন, আমি আপনার সামনে আসার সাহস পাইনি।

আজ তবে কেমন করে সাহস হল?

রহমত বলে ওঠে— সর্দার, আমি নারন্দি থেকে ফিরে আসার সময় কান্দাইয়ের বনের নিকটে ওকে দেখতে পাই। ও আমাকে দেখে চোরের মত পালাতে যাচ্ছিল। আমি ওকে ধরে আনি।

বনহুর হুঙ্কার ছাড়ে— এ কথা সত্যি?

পালাচ্ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছু আমি চুরি করিনি।

নেকলেসখানা কি করেছ?

আমার কাছেই আছে। এই যে সর্দার। ফতুয়ারা পকেট থেকে নেকলেস ছড়া বের করে বনহুরের সম্মুখে মেলে ধরে—আমি তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান হয়ে গেছি—তাই নেকলেসটা আমার কাছেই রয়েছে।

বনহুর কিছু বলার পূর্বে মহসীন বলে ওঠে— সর্দার, কাসেম যা বলছে সত্য নয়। এখন ধরা পড়ে সাধু সেজেছে।

গর্জে ওঠে বনহুর—চুপ কর মহসীন। কাসেম যা বলছে মিথ্যা নয়।

সর্দার! আনন্দধ্বনি করে ওঠে কাসেম। দু'চোখে তার কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে। এতদিন যাঁর ভয়ে সে বন হতে বনান্তরে, শহরে, গ্রামে লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরেছে— তিনি স্বয়ং তার পক্ষে। আনন্দ উপচে পড়ল কাসেমের মুখমণ্ডলে।

বনহুর কাসেমের হাত থেকে নেকলেস ছড়া হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলল যাও কাজে যোগ দাও।

কাসেম এবং মহসীন বেরিয়ে গেল।

বনহুর রহমতকে লক্ষ্য করে বললো— রহমত, সেই অন্ধ রাজার খবর কি?

খবর ভাল। তাঁকে তাঁর ছোট ভাই বন্দী করবার ফন্দি এঁটেছিলো, আমি তা নষ্ট করে দিয়েছি।

কিভাবে এ কাজ করলে তুমি?

আমি তাঁর সেই দলিল চুরি করে এনেছি। কাজেই আদালতে বিনা বিচারে অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন খালাস পেয়ে গেছেন।

একথা তুমি তো জানাওনি রহমত?

সর্দার, ক'দিন আপনার সাক্ষাৎ কামনায় ঘুরেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি।

দলিলখানা তোমার কাছে আছে?

আছে সর্দার!

ওটা আমাকে দিয়ে যাও। সময়ে প্রয়োজন হতে পারে।

জামার ভেতর থেকে একটা লম্বা ধরনের কাগজ বের করে বনহুরের হাতে দেয় রহমত।

বনহুর একটু দৃষ্টি বুলিয়ে পুনরায় ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলে— বেচারা মোহন্ত তাহলে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন—

আপনারই দয়ায় সর্দার।

না, রহমত, এটা তোমার সৌজন্যতায়।

আপনি হুকুম না করলে আমি কি যেতে পারতাম সর্দার? কিন্তু এখনও অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন নিরাপদ নয়।

তা জানি। কিন্তু উপস্থিত আমি একটা মহাসংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছি রহমত--- যা ,একটু অবসর পেলেই আমি মোহন্ত সেনের ছোটভাই রাজা যতীন্দ্র সেনকে দেখে নেব। আচ্ছা, এখন যাও রহমত।

রহমত দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছু ডাকে বনহুর— শোনো, এই নেকলেস ছড়া তুমি.... না না থাক, আমিই পৌঁছে দেব। যাও।

রহমত বেরিয়ে যায়।

বনহুর নেকলেস ছড়া প্যান্টের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

❑

সাদা চুনকাম করা বিরাট দোতলা বাড়ি। যদিও বহুদিন বাড়িখানায় নতুন রঙের ছোঁয়া লাগেনি তবু দূর থেকে বাড়িখানাকে ধোপার ধোয়া কাপড়ের মতই সাদা ধবধবে লাগে।

মাঝে মাঝে চুন-বালি-খসে পড়েছে, কোথাও বা শেওলা ধরে কালচে রং হয়েছে, কিন্তু জোস্নাভরা রাতে এসব কিছুই নজরে পড়ে না। বাড়ির সম্মুখে রেলিং ঘেরা চওড়া বারান্দা। বারান্দার নিচেই লাল কাঁকর বিছানো সরুপথ।

বাড়িখানা কোন শহরে নয়, গ্রামে।

বাড়ির মালিক বিনয় সেন, মধু সেনের বাবা।

গভীর রাত।

সমস্ত বাড়িখানা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। তারই মাঝে ষোড়শী চাঁদ হাসছে। বাড়ির পেছনে আমবাগান। জোস্নার আলো তাই বাড়ির পেছনটাকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়নি।

অন্ধকারে আত্মগোপন করে বনহুর এসে দাঁড়াল প্রাচীরের পাশে। অতি সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল প্রাচীরের ওপর।

নিঝুমপুরীর মত বাড়িখানা ঝিমিয়ে পড়েছে।

বনহুর দোতলার পাইপ বেয়ে উঠে গেল। সম্মুখের কক্ষটার মধ্যে নীল আলো জ্বলছে। জানালার শার্সী খুলে উকি দিল। এটা বিনয় সেনের কক্ষ বুঝতে পারল সে। কারণ বিছানায় একজন মাত্র বয়স্ক লোক ঘুমিয়ে রয়েছেন।

বনহুর এগুলো সামনের দিকে।

পাশাপাশি দু'খানা কক্ষ পেরিয়ে ওপাশের কক্ষটায় মৃদু আলোকরশ্মি দেখতে পেল সে।

বনহুর কাঁচের শার্সীর ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ডিমলাইটের ক্ষীণালোকে দেখতে পেল একটা খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানায় পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে সুভাষিণী আর মধু সেন। সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মধুসেনের বুকের উপর।

বনহুর কালবিলম্ব না করে কৌশলে কক্ষে প্রবেশ করল। লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে খাটের পাশে। প্যান্টের পকেট থেকে নেকলেস ছড়া বের করল।

কক্ষের স্বল্পালোকে নেকলেসের মতিগুলো ঝকমক করে উঠল নেকলেস ছাড়া অতি সন্তর্পণে সুভাষিণীর শিয়রে রেখে ওপাশের জানাল দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমবাগানে প্রবেশ করতেই নারীকণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—দাঁড়াও!

থমকে দাঁড়াল বনহুর। কালো পাগড়ীর ঝোলানো অংশটা ভাল করে গুঁজে দিল কানের একপাশে। মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলো বনহুর। আমগাছের পাতার ফাঁকে জোস্নার কিঞ্চিৎ আলো এসে পড়েছে, পেছনের সেই নারীর মুখমণ্ডলে। বনহুর অবাক হয়ে দেখলো, অদূরে দাঁড়িয়ে সুভাষিনী। হাতে সেই নেকলেস ছড়া।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সুভাষিণী এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। আমবাগানের আবছা অন্ধকারে নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সে বনহুরের মুখের দিকে। শুধুমাত্র চোখ দুটো ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। আরও সরে দাঁড়াল সুভাষিণী, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল আজ তোমায় ধরেছি। তুমি না দস্যু; অমন করে চোরের মত পালাচ্ছিলে কেন?

বনহুর নিশ্চুপ।

সুভাষিণী হেসে বলল— কি, জবাব দিচ্ছো না যে? তোমার সব চালাকি ফাঁস হয়ে গেছে দস্যু। নিয়ে যাও, তোমার এ নেকলেস নিয়ে যাও। বনহুরের দিকে ছুড়ে মারে সুভাষিণী নেকলেস ছড়া।

সুভাষিণীর ছুড়ে মারা নেকলেস ছড়া বনহুরের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। বনহুর চট করে ধরে ফেলে নেকলেসখানা।

সুভাষিণী দেখল আমবাগানের ঝাপসা আলোতে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে সুভাষিণীর দিকে তাকিয়ে নেকলেস ছড়া ছুঁড়ে ফেলে দিল আমবাগানস্থ পুকুরের জলে।

ঝুপ করে একটা শব্দ হল।

সুভাষিণী হতবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকাল পুকুরের দিকে। জ্যোস্নার আলোতে সে দেখতে পেল, পুকুরের জলে যেখানে নেকলেস ছড়া ডুবে গিয়েছিল সেখানে কয়েকটা বুদবুদ ভেসে উঠেছে। ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হল সে। তার আশেপাশে কেউ নেই। যেখানে দস্যু বনহুর দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে খানিকটা জ্যোস্নার আলো ছড়িয়ে রয়েছে মাটির বুকে।

বিষণ্ন মনে সুভাষিণী ফিরে এলো নিজের ঘরে।

স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল কতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে। তারপর স্বামীর চুলে হাত বুলিয়ে ডাকল— ওঠো, কত ঘুমাচ্ছ?

চোখ মেলে তাকালো মধু সেন, তারপর, সুভাষিণীকে টেনে নিলো কাছে। আবেগভরা কণ্ঠে বলল— তোমার ঘুম ভেঙে গেছে সুভা?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলল সুভাষিণী।

❑

খান বাহাদুর ব্যস্তসমস্ত হয়ে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করলেন। চোখে মুখে তাঁর উদ্বিগ্নতা। ললাটে গভীর চিন্তারেখা, বিষণ্ন মুখমণ্ডল।

পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতেই মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, বললেন....ব্যাপার কি খান বাহাদুর সাহেব?

খান বাহাদুর সাহেব বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—কি আর বলবো ইন্সপেক্টার, আমার একমাত্র পুত্র নিয়ে কি যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করছি!

বসুন। মিঃ হারুন নিজেও আসন গ্রহণ করলেন।

খান বাহাদুর সাহেব আসন গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার পুত্র মুরাদ তো এখন জামিনে আছে?

হ্যাঁ ইন্সপেক্টর, ওকে আমি জামিনে খালাস করে নিয়েছিলাম—কি করবো বলুন, একমাত্র সন্তান....কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে তিনি বললেন—গত কাল থেকে আবার সে কোথায় উধাও হয়েছে।

মুহূর্তে মিঃ হারুনের চোখ দুটো রাঙা হয়ে । ওঠে তিনি প্রায় চিৎকার করে ওঠেন—এ কি বলছেন খান বাহাদুর সাহেব? জানেন সে অপরাধী?

কি করবো বলুন, আমি যে পাগল হবার-জোগাড় হয়েছি।

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জামিনের অপরাধী যদি পলাতক হয়, সেজন্য আইনে জামিনদার অপরাধী—এ কথা আপনার হয়তো অজানা নেই?

সে কথা আমি জানি ইন্সপেক্টর। কিন্তু কি করবো বলুন। আমি যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন— খান বাহাদুর সাহেব–একমাত্র পুত্রকে আমি মানুষের মত মানুষ করতে চেয়েছিলাম। অনেক আশা–ভরসা ছিল ওর ওপর আমার, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল, উচ্চশিক্ষিত করার জন্য ওকে আমি বিলেত পাঠালাম। টাকা-পয়সা ঐশ্বর্য যা যখন চেয়েছে তাই আমি ওকে দিয়েছি। কোনো অভাব আমি ওকে বুঝতে দেইনি। তবু....

সেই কারণেই আপনার পুত্র অধঃপতনে গেছে। বেশি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা আপনি খেয়ে ফেলেছেন খান বাহাদুর সাহেব।

হয়তো তাই। মা-মরা সন্তান বলে কোনদিন ওকে আমি আঘাত করিনি, করতে পারিনি। সেটাই হয়েছে আমার জীবনের চরম ভুল।

দেখুন খান বাহাদুর সাহেব, এখন আফসোস করে কোন ফল হবে না। আপনার পুত্রকে খুঁজে বের করুন।

আমি এ দু'দিনে বহু জায়গায় সন্ধান নিয়েছি, কিন্তু কোথাও পেলাম না। এখন আপনাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। ইন্সপেক্টার, আপনি দয়া করে—

আপনার অনুরোধ জানাতে হবে না খান বাহাদুর সাহেব। এক্ষুণি আপনার পুত্র মুরাদের নামে আমরা ওয়ারেন্ট বের করছি।

খান বাহাদুর সাহেব প্রস্থান করার পর মিঃ হারুন সাব ইন্সপেক্টার জাহেদ আলী সাহেবকে ডেকে সমস্ত বুঝিয়ে বললেন। খান বাহাদুর সাহেবের ছেলের নামে ওয়ারেন্ট বের করার আদেশ দিলেন।

গোটা শহরে সি. আই. ডি. অফিসাররা মুরাদের খোঁজে ছড়িয়ে পড়লেন।

মিঃ আলম কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুমাত্র মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। তিনি ব্যাপারটা শোনার পর নিশ্চুপ রইলেন।

একদিন পুলিশ অফিসে মিঃ হারুন, মিঃ জাফরী এবং মিঃ আলম বসে মুরাদের অন্তর্ধান ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিল। মিঃ হোসেনও আজ অফিসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর দক্ষিণ হাতের ক্ষত শুকিয়ে গেছে। তিনি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

মিঃ হোসেন বলে ওঠেন—আমার মনে হয় সেই ছায়ামূর্তি অন্য কেউ নয়–ঐ শয়তান মুরাদ...এই তিনটা হত্যাও সে-ই করেছে।

আমারও এখন সেরকমই মনে হচ্ছে। গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন–মুরাদই যে ছায়ামূর্তি এবং সে-ই যে এই তিনটি খুন সংঘটিত করেছে তার কোন প্রমাণ এখনও আমরা পাইনি।

মিঃ হারুন বললেন–স্যার, আপনি মুরাদ সম্বন্ধে তেমন বেশি কিছু জানেন না। এতবড় বদমাইশ বুঝি আর হয় না। ধনকুবের খান বাহাদুর সাহেবের একমাত্র সন্তান মুরাদ যেন শয়তানের প্রতীক।

মিঃ জাফরী বললেন— আমি এই মুরাদ সম্বন্ধে পুলিশের ডায়েরী থেকে কিছু জানতে পেরেছি, আরও জানা দরকার।

হ্যাঁ স্যার, এই দুষ্ট শয়তান নাথুরামের সহায়তায় একেবারে শয়তানির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কি দস্যু বনহুরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল

সে। চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, নারী হরণ-দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বল্লেন মিঃ হারুন।

মিঃ হোসেন বলেন—এবার সে হত্যাকাণ্ডও শুরু করেছে।

মিঃ জাফরী মিঃ আলমকে লক্ষ্য করে বলেন—আপনি নিশ্চুপ রইলেন কেন? কিছু মন্তব্য করুন। আপনার কি মনে হয় এই হত্যারহস্যের সঙ্গে পলাতক মুরাদ জড়িত?

একথা সোজাসুজি বলা মুস্কিল স্যার। তবে মুরাদকে যতক্ষণ পাওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। মিঃ আলম কথাটা বলে থামলেন।

এমন সময় ডাক্তার জয়ন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন পুলিশ অফিসে প্রবেশ করে ব্যস্তকণ্ঠে জানালেন—স্যার, আজ আবার সেই ছায়ামূর্তি আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল এবং আবার বাবার সহকর্মী নিমাই বাবুকে....

অস্ফুট শব্দ করেন মিঃ হারুন-খুন করেছে?

না। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বসুন। বসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলুন—বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি হেমন্ত সেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন।

হেমন্ত সেনের মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—গভীর রাতে হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি দ্রুত কক্ষের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নজরে পড়ল একটা জমকালো ছায়ামূর্তি সদর দরজা দিয়ে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সন্ধান নিয়ে দেখলাম কোন ঘরে কিছু হয়নি। শুধু নিমাই বাবুর কক্ষে তিনি নেই দেখতে পেলাম। অনেক খোঁজাখুজি করেও বাড়ির কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। কক্ষে শূন্য বিছানা পড়ে রয়েছে।

হুঁ ব্যাপারটা দেখছি ক্রমান্বয়ে জটিল রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছে। গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন এবং মিঃ আলম নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলেন, মিঃ আলম বলে ওঠেন—এই রহস্যজাল কৌশলে গুটিয়ে আনতে হবে।

মিঃ জাফরী মৃদু হেসে বললেন—সেই জালের মধ্যে যে জড়িয়ে পড়বে সেই । হচ্ছে ছায়ামূর্তি।

হেমন্ত সেন নিমাইবাবুর নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে পুলিশ অফিসে ডায়েরী করে বিদায় হলেন।

সেদিন মিঃ জাফরী আর বেশিক্ষণ অফিসে বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আজ অন্য কোথাও গেলেন না। ড্রাইভারকে বাংলো অভিমুখে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিলেন।

মিঃ জাফরীর গাড়ি যখন ডাকবাংলার গেটের মধ্যে প্রবেশ করল ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কালো রঙের গাড়ি গেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে মিঃ জাফরীর গাড়ির পাশ কেটে চলে গেল।

মিঃ জাফরী লক্ষ্য করলেন, গাড়ির হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে বসে আছে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি।

মাত্র এক মুহূর্ত, ছায়ামূর্তিসহ গাড়িখানা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল–ড্রাইভার, ঐ গাড়িখানা অনুসরণ কর।

ড্রাইভার গাড়িখানা বাংলোর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পুনরায় বের করে আনল এবং অতি দ্রুত গাড়ি চালাতে শুরু করল।

কিন্তু ততক্ষণে সম্মুখস্থ গাড়িখানা বহুদূর এগিয়ে গেছে।

মিঃ জাফরী দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাবার জন্য আদেশ দিলেন। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটল। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিপথে ছুটতে লাগল এবার মিঃ জাফরীর গাড়িখানা। হঠাৎ দেখা গেল পথের একপাশে সেই ছোট্ট কালো রঙের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গাড়ির চালক ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে।

মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে গাড়ি রাখতে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার আদেশ পালন করল।

গাড়ি থেমে পড়তেই মিঃ জাফরী প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। হ্যাঁ, এই সেই গাড়ি, যে গাড়িতে একটু পূর্বে তিনি ছায়ামূর্তিকে দেখেছিলেন।

মিঃ জাফরীর চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলে উঠলো। তিনি দ্রুত ছুটে এসে ঝুঁকে পড়া লোকটার পিঠে রিভলভার চেপে ধরে গর্জে উঠলেন–খবরদার!

গাড়ির চালক মুখ তুলল। একি! বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ জাফরী—মিঃ শঙ্কর রাও!

মিঃ শঙ্কর রাও হেসে বলেন—হঠাৎ এভাবে আপনি, আমাকে....

আপনিই এখন আমার ডাকবাংলোর দিক থেকে আসছেন না?

আসছি নয়, যাচ্ছি স্যার। গোপনে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

মিঃ জাফরী হতবুদ্ধির মত রিভলভারখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন–এ গাড়িখানা আপনার?

মিঃ শঙ্কর রাও বললেন—না স্যার, এ গাড়ি আমার এক আত্মীয়ের। আমার গাড়িখানা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই গাড়ি চেয়ে নিয়ে এসেছি। দেখুন তো, এটাও হঠাৎ বিগড়ে বসেছে।

হুঁ। মিঃ জাফরী একটা শব্দ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন–আসুন আমার গাড়িতে। ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলেন–তুমি দেখো ওটার কি নষ্ট হয়েছে।

মিঃ শঙ্কর রাও মিঃ জাফরীর গাড়িতে চেপে বসলেন।

মিঃ জাফরী নিজেই ড্রাইভ করে চললেন।

বাংলোয় ফিরে মিঃ জাফরী অবাক হলেন।

মিঃ জাফরীর কক্ষে বাংলোর দারোয়ানকে বন্দী অবস্থায় পাওয়া গেল। হাত-পা মজবুত করে বাঁধা। মুখে একটা রুমাল গোঁজা। হাতের বন্দুকখানা তার হাতের সঙ্গেই দড়ি দিয়ে জড়ানো। মিঃ জাফরী প্রবেশ করেই এ দৃশ্য দেখতে পেলেন।

শঙ্কর রাও ব্যস্তসমস্ত হয়ে দারোয়ানের হাত-পা'র বাঁধন খুলে দিতে শুরু করলেন।

মিঃ জাফরী হুঙ্কার ছাড়লেন—বয়, বয়..

কোন সাড়া নেই। গোটা বাংলো যেন নিঝুমপুরী হয়ে রয়েছে।

ততক্ষণে শঙ্কর রাও দারোয়ানের হাত-পার বাঁধন খুলে দিয়েছেন। মুখের রুমালখানা বের করে ফেলেছেন তিনি।

দারোয়ান মুক্তি পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে– হুজুর, এক ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি!

ছায়ামূর্তি? অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ জাফরী।

দারোয়ান কাঁপতে কাঁপতে বলল— সারা শরীরে তার কালো আলখেল্লা। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল হুজুর। একেবারে ভূতের মত কালো দু'খানা হাত।

শঙ্কর রাওয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি অবাক হয়ে রইলেন –একি কাণ্ড স্যার?

মি ঃ জাফরী গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন? মিঃ শঙ্কর রাওয়ের কথায় কান দিলেন না। দারোয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন—আর সব ওরা কোথায় গেলো?

ছায়ামূর্তি সবাইকে পাকের ঘরে বন্ধ করে রেখেছে হুজুর।

এসব তুমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলে শুধু?

না হুজুর। আমাকেও ঐ পাকের ঘরে আটকে ফেলেছিল, পরে কি মনে করে আবার টেনে এই ঘরে এনে রেখে গেল।

দেখুন স্যার, ঘরের জিনিসপত্র তো ঠিক আছে? কথাটা বললেন শঙ্কর রাও।

মিঃ জাফরী কিছু বলার পূর্বেই বলে উঠল দারোয়ান– হুজুর, ছায়ামূর্তি ঘরের কোন জিনিসেই হাত দেয়নি, শুধু ঐ যে টেবিলে কাগজখানা দেখছেন ওটা সে রেখে গেছে।

বল কি, ছায়ামূর্তি চিঠি রেখে গেছে! মিঃ জাফরী এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে কাগজখানা তুলে নিলেন হাতে। লাইটের উজ্জ্বল আলোতে মেলে ধরে পড়লেন– 'হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। তুমি ফিরে যাও জাফরী।'

শঙ্কর রাও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন– আশ্চর্য স্যার।

শুধু আশ্চর্য নয় মিঃ রাও, অত্যন্ত বিস্ময়কর। ছায়ামূর্তির এই দুই ছত্র লেখার মধ্যে গভীর রহস্য লুকানো রয়েছে। ছায়ামূর্তি আমাকে ফিরে যাবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে ... হঠাৎ মিঃ জাফরী অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন– হাঃ হাঃ হাঃ, ছায়ামূর্তির চেয়ে জাফরী কোন অংশে বুদ্ধিহীন নয়। চলুন মিঃ শঙ্কর রাও, আপনার কথাটা এবার শোনা যাক।

চলুন স্যার।

মিঃ জাফরী বাংলোর বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

❑

অতো কেঁদে আর কি হবে বিবি সাহেবা! এটা দুনিয়ার খেলা, জীবন মৃত্যু এ যে মানুষের সাথী! জন্মালে একদিন মরতে হবেই? সরকার সাহেব মরিয়ম বেগমকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

মরিয়ম বেগম অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলেন— সরকার সাহেব, আমি যে সাগরের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। এই দুর্দিনে ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তাই একটু সান্ত্বনা।

বিবি সাহেবা, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু চিন্তা না করে কোন উপায় নেই সরকার সাহেব। চিন্তা না করলেও কোথা থেকে একরাশ চিন্তা এসে মাথার মধ্যে সব এলোমেলো করে দেয়। জানি জন্ম-মৃত্যুকে মানুষ কোন দিন পরিহার করতে পারবে না চৌধুরী সাহেবের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত তাহলে আমি এত শোকাভিভূতা হতাম না। কিন্তু তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়– কে তাঁকে হত্যা করল, কেন তাঁকে হত্যা করা হল, কি তাঁর অপরাধ ছিল?– এসব প্রশ্ন আমাকে পাগল করে তুলেছে সরকার সাহেব। একটু থেমে পুনরায় বললেন মরিয়ম বেগম— মা মনিরার অবস্থাও তো স্বচক্ষে দেখছেন। ওর মামুজানের মৃত্যুর

পর মেয়েটা কেমন হয়ে গেছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সব সময় উদ্‌ভ্রান্তের মত বিছানায় পড়ে থেকে শুধু চোখের পানি ফেলে। মা আমার দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওর চোখের পানি আমার আরও অস্থির করে তুলেছে। কি করে আমি চিন্তামুক্ত হই বলুন?

বিবি সাহেবা, পুলিশমহল চৌধুরী সাহেবের হত্যাকাণ্ডের গোপন রহস্য উদঘাটনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। মিঃ জাফরী সদা-সর্বদা এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে ছুটাছুটি করছেন। নিশ্চয়ই এ রহস্য ভেদ হবেই এবং হত্যাকারীর কঠিন সাজাও হবে।

কিন্তু আমি আর কি তাঁকে ফিরে পাবো সরকার সাহেব!

কেউ তা পায় না বিবি সাহেবা। মৃত্যুর গভীর ঘুম থেকে কেউ আর জেগে ওঠে না।

তবে?

শুধু সান্ত্বনা হবে দোষীর উচিত সাজা হয়েছে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে নকিব—আম্মা, ইন্সপেক্টার সাহেব এসেছেন, আপনার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান। সঙ্গে এক সাহেব লোক আছেন।

দেখুন তো সরকার সাহেব?

সরকার সাহেব বেরিয়ে যান, একটু পরে ফিরে এসে বলেন—বিবি সাহেবা, ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন এসেছেন—একজন ভদ্রলোকও আছেন তাঁর সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম বললেন– উনাদেরকে ভিতর বাড়ির বৈঠকখানায় এনে বসান সরকার সাহেব, আমি আসছি।

সরকার সাহেব পুনরায় বেরিয়ে যান। তিনি মিঃ হারুন এবং তাঁর সঙ্গীকে হলঘরে বসিয়ে অন্দরবাড়িতে খবর দিতে গিয়েছিলেন, এবার তিনি ভদ্রমহোদয়কে ভিতরবাড়ির বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন।

একটু পর মরিয়ম বেগম বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে সালাম জানালেন মিঃ হারুন এবং তাঁর সঙ্গের ভদ্র-লোক। ভদ্রলোক অন্য কেউ নয়, মিঃ আলম।

মিঃ হারুন প্রথমে মিঃ আলমের সঙ্গে মরিয়ম বেগমের পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ আলম। ইনি একজন গোয়েন্দা। তবে মাইনে করা নয়—সখের গোয়েন্দা। মিসেস চৌধুরী, ইনি চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদঘাটনে আমাদের সহায়তা করে চলেছেন।

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন—আমি উনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

মিসেস চৌধুরী, উনি আপনার নিকটে যা জানতে চাইবেন, বিনা দ্বিধায় বলে যাবেন। কিছু যেন লুকাবেন না। এমনকি আপনার পুত্র সম্বন্ধেও কিছু গোপন করবেন না।

মরিয়ম বেগম মাথা দুলিয়ে বললেন– আচ্ছা।

মামীমার সঙ্গে যখন মিঃ হারুন এবং মিঃ আলমের কথাবার্তা হচ্ছিল তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিরা সব লক্ষ্য করছিল ও শুনে যাচ্ছিল।

মিঃ আলম চৌধুরী সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে মরিয়ম বেগমকে তখন প্রশ্ন করছিলেন– মিসেস চৌধুরী, আপনার স্বামীর কি কোন শত্রু ছিল বলে আপনার ধারণা হয়?

না, আমার স্বামীর কোন শত্রু ছিল না। তিনি অতি মহৎ লোক ছিলেন। ইন্সপেক্টার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

মহৎ ব্যক্তিরও শত্রু থাকে মিসেস চৌধুরী। বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ আলম বলে ওঠেন– আমি চৌধুরী সাহেবের মহত্ব, উদারতা এবং চরিত্র সম্পর্কে পুলিশ অফিস থেকে জানতে পেরেছি। তবু আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

করুন।

দেখুন আপনি আমার কাছে কিছুই গোপন করবেন না।

না, কিছু গোপন করব না। জিজ্ঞাসা করুন।

আপনার পুত্র সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। তাকে আপনারা ক'বছর আগে হারিয়েছিলেন?

ঠিক আমার স্মরণ নেই, তবে বছর চৌদ্দ-পনেরো এমনি হবে।

সে হারিয়ে যাবার পর আপনি একটা মেয়েকে কন্যা বলে গ্রহণ করেছেন।

হ্যাঁ, সে আমার ননদের মেয়ে, নিজের মেয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

চৌধুরী সাহেবের অবর্তমানে সেই কি আপনাদের এই বিষয়-আশয়ের একমাত্র অধিকারিণী ?

হ্যাঁ, সে ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।

কেন, আপনার পুত্র মনিরকে আপনি অস্বীকার করেন?

করি না। কিন্তু সে তো আর নেই।

চৌধুরী সাহেবের হত্যা ব্যাপারে আপনার ভাগ্নীর কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে তো–

চুপ করুন! পৃথিবী পাল্টে গেলেও ওসব আমি বিশ্বাস করব না, করতে পারি না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর মরিয়ম বেগমের।

মনিরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল, এত বড় একটা মিথ্যা সন্দেহ কেউ করতে পারে এ যেন তার ধারণার বাইরে। রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগল সে।

মরিয়ম বেগম বলে চলেছেন, মনিরা ওর মামার মৃত্যুর পর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে। ফুলের মত সুন্দর মুখখানা ওর শুকিয়ে গেছে। কি যে বলেন আপনারা, ও কথা আমি কখ্খনো বিশ্বাস করব না। তাছাড়া মনিরা আমার ঘরের মেয়ে।

মিসেস চৌধুরী, আমি আপনার ভাগ্নী মিস মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

মিঃ হারুন বললেন– মিঃ আলম, আপনি মিস মনিরার সঙ্গে পরিচিত হলেই বুঝতে পারবেন, সে তেমন ধরনের মেয়েই নয়।

মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– সরকার সাহেব, মনিরাকে ডাকুন।

মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হতে না হতেই কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা, চোখ মুখের ভাব উগ্র; তীব্রকণ্ঠে বলল– আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ মা, ইনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

মিঃ আলমের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

বললেন– বসুন মিস মনিরা।

বলুন কি বলবেন? মনিরা না বসেই রাগত কণ্ঠে কথাটা বলে।

আবার একটু হাসলেন মিঃ আলম।

মিঃ হারুন বললেন– মিস মনিরা, উনি যা জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর দিন।

নিশ্চয়ই দেব।

মিঃ আলম বললেন—আপনি অযথা ক্ষুণ্ন হচ্ছেন মিস মনিরা। জানেন আপনার মামার হত্যা ব্যাপারে আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি?

মিথ্যা আপনাদের সন্দেহ। মামুজানের হত্যা ব্যাপারে আপনাদেরই যে চক্রান্ত নেই তাই বা কে জানে! আমি শুনেছি, আমার মামুজান সেদিন যে পার্টিতে যোগ দিয়ে জীবন হারিয়েছেন, ঐ পার্টিতে আপনারাও উপস্থিত ছিলেন।

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন মিঃ আলম।

মিঃ হারুনও মিঃ আলমের হাসিতে যোগ দিলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—দেখলেন মিঃ আলম, মিস মনিরা এখন আমাদেরকেই তার মামুজানের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে নিয়েছেন।

এবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন মিঃ আলম— মিস মনিরার সন্দেহ অহেতুক নয় মিঃ হারুন। চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী কে এখনও তা কেউ জানে না। কাজেই আপনি, আমি, মিস মনিরা কিংবা তার দস্যুপুত্র বনহুরও হতে পারে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম—না না, আমার মনির কখনও এ কাজ করতে পারে না।

তবে কাকে আপনার সন্দেহ হয় মিসেস চৌধুরী? প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

মরিয়ম বেগম জবাব দিলেন- কেমন করে বলব! আমার স্বামী যে ফেরেস্তার মত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর যে কোন শত্রু ছিলো না, তা-ই আমি জানি।

মিঃ আলম এবার মনিরাকে লক্ষ্য করে বলেন- মিস মনিরা, আপনিও জানেন আপনার মামুর কোন শত্রু ছিল না বা নেই। তবে কে তাঁকে হত্যা করল, আর কেনই বা করল?

আমিও সেই প্রশ্ন আপনাকে করছি। কারণ আমার মামুর হত্যাকালে আমি সেখানে ছিলাম না, বরং আপনারা সেখানে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুকালেও উপস্থিত ছিলেন।

তাহলে উনার পুত্র বনহুরের চক্রান্তে?

না, তাও নয়। সে দস্যু হতে পারে, সে ডাকু হতে পারে, কিন্তু পিতৃহত্যাকারী নয়। তীব্র কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে মনিরা।

মিস মনিরা, আপনি ভুল করছেন। দস্যু-ডাকুদের আবার ধর্ম, জ্ঞান আছে নাকি! আমার মনে হয় দস্যু বনহুরই তার পিতাকে হত্যা করেছে। পূর্বের ন্যায় স্থির কণ্ঠে বললেন— মিঃ আলম।

অসম্ভব! মনিরা যেন চিৎকার করে ওঠে। একটু থেমে পুনরায় বলে— পিতাকে হত্যা করতে যাবে সে কোন্ লাভে?

পিতাকে হত্যা করলে তার দুটি উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে মিস মনিরা, এটাও কম নয়। একটা হচ্ছে প্রচুর ঐশ্বর্য, অন্যটা হয়তো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

ঐশ্বর্যের লালসা দস্যু বনহুরের নেই, এটা আমি জানি। দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠে মনিরা।

মিঃ আলম মনিরার কথায় অট্টহাসি হেসে ওঠেন—হাঃ হাঃ হাঃ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—তাহলে সে দস্যুবৃত্তি করে কেন?

দস্যুতা তার নেশা—পেশা নয়।

মিস মনিরা, আপনি তাকে ভালবাসেন এ কথা আমরা জানি।

সবাই জানে। আপনিও জানবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু একজন দস্যুকে ভালবাসা অপরাধ, এটাও আপনি হয়ত জানেন?

ভালবাসা অপরাধ নয়। আমি আর আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। আপনারা এখন যেতে পারেন। মনিরা যেমন দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করছিলো তেমনি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মিঃ আলম উঠে দাঁড়ান —চলুন মিঃ হারুন, আমার যা প্রশ্ন করার ছিল করা হয়েছে।

মরিয়ম বেগমও উঠে দাঁড়ান—দেখুন, ওর কথায় আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।

না, না, আমরা এতে কিছু মনে করিনি। এসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কথাটা বলে মিঃ আলম দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মিঃ হারুন তাঁকে অনুসরণ করলেন।

মরিয়ম বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—সরকার সাহেব, মনিরার ব্যবহারে ওরা রাগ করেননি তো?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বিবি সাহেবা। মা মনি কোন অন্যায় বলেননি। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

কি জানি কখন কি ঘটে বসে—ভয় হয়।

❑

দেখ মা, তখন পুলিশের লোককে অমন করে বলা ঠিক হয়নি। শান্তকণ্ঠে মনিরার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা বিছানায় শুয়ে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ মণ্ডল বিষণ্ণ। চোখ দু'টি লাল। একটু পূর্বে হয়ত কেঁদেছে সে। মামীমার কথায় বইখানা পাশে রেখে বিছানায় উঠে বসল, কোন কথা বলল না।

মরিয়ম বেগম স্নেহভরা গলায় পুনরায় বললেন—আমাদের দেখার এক খোদা ছাড়া কেউ নেই। এ অবস্থায় পুলিশের লোকরা যদি ক্ষেপে যায় তাহলে আর যে কোন উপায় থাকবে না মা।

মামীমা, এই না বললে খোদা ছাড়া কেউ নেই। তবে কেন মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো? সত্যি কথা বলব তাতে ভয় কি? পুলিশের লোক হলো বলেই তাদের আমি তোষামোদ করে চলতে পারব না। মামীমা, যে পুলিশের লোক অযথা একজনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে, তাদের আমি সমীহ করে চলব, এমন মনোবৃত্তিও আমার হবে না। অদৃষ্টে যা আছে হবেই মামীমা, কেন তুমি এত করে ভাবছ? দুনিয়ায় যাদের কেউ নেই তাদের কি দিন যায় না?

আজ যদি আমার মনির থাকত--- বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ।

কে বলে তোমার মনির নেই? দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটা গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর।

চমকে ফিরে তাকায় মনিরা, ফিরে তাকান মরিয়ম বেগম। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উভয়ের মুখমণ্ডল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর।

মনিরা ত্বরিত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এত ব্যথা বেদনার মধ্যেও তার মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত হয়ে উঠল। ঠোঁট দু'খানা একটু নড়ে উঠে থেমে গেল।

মরিয়ম বেগম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন– মনির, বাবা তুই এসেছিস? ওরে মনির--- দুই হাত প্রসারিত করে দেন মরিয়ম বেগম পুত্রের দিকে– ওরে আয়!

বনহুরের মুখমণ্ডলে খেলে যায় এক অভূতপূর্ব আনন্দের দ্যুতি। ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠে– মা!

ওরে আমার পাগল ছেলে! ওরে আমার মনির, কোথায় লুকিয়ে থাকিস্ বাবা তুই?

এই তো মা আমি তোমাদের পাশে।

আর আমি তোকে যেতে দেব না। কিছুতেই তোকে ছেড়ে দেব না মনির।

মাতা পুত্রের এই অপূর্ব মিলন মনিরার হৃদয়ে এক আনন্দের উৎস বয়ে আনে। নিষ্পলক নয়নে সে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করে এই পবিত্র মধুময় দৃশ্য।

মরিয়ম বেগম বনহুরকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললেন—আমাদের দেখার কেউ যে নেই বাবা।

কেন, আমি রয়েছি তো। যখন তুমি আমায় ডাকবে, দেখবে আমি তোমাদের পাশে রয়েছি।

বাবা মনির!

হ্যাঁ মা, আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি?

জানিস্ বাবা, আজ পুলিশ এসেছিল। কি রকম সব কথাবার্তা তাদের। আমার বড্ড ভয় করে।

কোন ভয় নেই মা। যতক্ষণ তোমার মনির বেঁচে আছে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভয় নেই। যত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক সব আমি বুক পেতে নেব। একটু থেমে বলে বনহুর-বাবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী মা।

মনির!

হ্যাঁ মা, আমি খেয়াল না দেবার জন্যই তিনি আজ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাঁর হত্যাকারীকে চরম শাস্তি ... কি বলতে গিয়ে থেমে যায় বনহুর।

মরিয়ম বেগম এবং মনিরা বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে শিউরে ওঠে। চোখ দুটো ওর আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠে। দাঁতে দাঁত পিষে সে। দ্রুত নিঃশ্বাসের দরুন প্রশস্ত বক্ষ বারবার ওঠানামা করে। দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ হয় তার।

মরিয়ম বেগম জীবনে পুত্রের এ রূপ দেখেননি। তিনি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কোন কথা বলার সাহস হয় না তাঁর।

কিছুক্ষণ কেটে যায়, প্রকৃতিস্থ হয় বনহুর।

মরিয়ম বেগম বলেন—বাবা, আজ বিশটি বছর তোর মুখে আমি খাবার তুলে দেইনি। আজ আমি তোকে খাওয়াব।

এত রাতে কি খাওয়াবে মা?

ওরে, ছোটবেলায় তুই দুধের পায়েস খেতে বড় ভালবাসতিস। আজ পনের বছর ধরে আমি দুধের পায়েস তৈরি করে তোর কথা ভাবি, প্রতিদিন আমি সাজিয়ে রাখি আমার ছোট আলমারীতে। পরদিন বিলিয়ে দেই গরীব বাচ্চাদের মুখে।

আজও বুঝি রেখেছ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ। তুই বোস আমি আসছি।

মনিরা বলে ওঠে—তুমি বস মামীমা, আমি আনছি।

না মা, তুই পারবি না, আমি আনছি। বেরিয়ে যান মরিয়ম বেগম।

মা বেরিয়ে যেতেই বনহুর উঠে দাঁড়াল, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল, সে মনিরার পাশে, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল— মনিরা!

বল।

কথা বলছ না যে?

মাতা-পুত্রের অপূর্ব মিলনে আমি যে মুগ্ধ হয়ে গেছি। স্বর্গীয় দীপ্তিময় এক জ্যোতির অনুভূতিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মনিরা! অস্ফুট শব্দ করে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে। গভীর আবেগে বুকে চেপে ধরে বলে—আর তোমাকে পেয়ে হয়েছে আমার জীবন পরিপূর্ণ।

ছিঃ ছেড়ে দাও! মামীমা এসে পড়বেন।

আসতে দাও। মনিরা, কতদিন তোমায় এমন করে পাশে পাইনি। মনিরা, আমার মনিরা!

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম, বাঁ হাতে তাঁর পায়েসের বাটি, দক্ষিণ হাতে পানির গ্লাস।

বনহুর মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সরে আসে মায়ের পাশে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হা করে —কই দাও।

মরিয়ম বেগম পানির গ্লাস টেবিলে রেখে ছোট্ট চামচখানা দিয়ে বাটি থেকে পায়েস নিয়ে মুখে তুলে দেন।

বনহুর মায়ের চেয়ে অনেক লম্বা তাই সে মাথা নীচু করে মায়ের হাতে পায়েস খেতে থাকে। তারপর খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে পানির গ্লাস নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বলে– আঃ কতদিন পর আজ আমি খেয়ে তৃপ্তি পেলাম। এমনি করে তোমার হাতে কতদিন খাইনি!

তোকে এমনি করে না খাওয়াতে পেরে আমিও কি শান্তিতে আছিরে! অহরহ আমার মনে তুষের আগুন জ্বলছে! ওরে, তোকে আমি ছেড়ে দেব না।

মা, তুমি আমাকে গ্রহণ করলেও সভ্যসমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না। আমি যে অপরাধী

না না, তা হয় না, আমি তোকে যেতে দেব না মনির, যেতে দেব না –মরিয়ম বেগম পুত্রের জামার আস্তিন চেপে ধরেন।

বনহুর মাকে সান্ত্বনা দেয়– তুমি তো জানো মা, তোমার পুত্রকে পাকড়াও করার জন্য পুলিশ অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার পুত্রকে গ্রেফতার করতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার পাবে। এমন অবস্থায় তুমি আমাকে রাখতে পারবে?

ধীর ধীরে বনহুরের জামার আস্তিন ছেড়ে দেন মরিয়ম বেগম, দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন তিনি– তবে কাকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকব বাবা?

মনিরাকে দেখিয়ে বলে বনহুর— ওকে নিয়ে। ঐ তো তোমার সব। কিন্তু ওকে কি আমি চিরদিন ধরে রাখতে পারব? জানিস তো, মনিরা এখন বড় হয়ে গেছে।

মায়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর। তার মা কি বলতে চান? মনিরা বড় হয়ে গেছে– একথা বলার পেছনে একটা ইংগিত রয়েছে, বুঝতে বাকী থাকে না বনহুরের। কিন্তু---না না, তা হয় না---- সে যে দস্যু, মনিরা নিষ্পাপ পবিত্র, তার সঙ্গে মনিরার জীবন জড়ানো যায় না।

বনহুর একবার মায়ের মুখের দিকে আর একবার তাকায় মনিরার মুখের দিকে। অসম্ভব, মনিরার জীবনটা সে নষ্ট করতে পারে না। একটা দস্যুকে বিয়ে করে সে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। বনহুর নিজের চুলের মধ্যে আংগুল চালনা করতে লাগল। কেমন অস্থির একটা ভাব ফুটে উঠল তার মধ্যে। হঠাৎ বলে উঠল—মা চললাম।

মনির! অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠেন মরিয়ম বেগম।

ততক্ষণে বনহুর পেছনের জানালা খুলে বেরিয়ে গেছে।

মনিরা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বের হল না তার মুখ থেকে।

❑

মিঃ জাফরীর ডাকবাংলোয় ছায়ামূর্তির আবির্ভাব নিয়ে পুলিশমহলে বেশ উদ্বিগ্নতা দেখা দিল। মিঃ জাফরী রাতেই পুলিশ অফিসে ফোন করেছিলেন। মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার তখনই ডাকবাংলোয় গিয়ে হাজির হলেন। মিঃ আলমও গিয়েছিলেন মিঃ হারুনের সঙ্গে।

অনেক অনুসন্ধানের পর এবং দারোয়ান ও বয়ের জবানবন্দী নিয়েও ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে এতটুকু সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হলেন না কেউ।

মিঃ শঙ্কর রাও যে আলোচনার জন্য বাংলো অভিমুখে আসছিলেন সে কথা সেদিনের মত স্থগিত রইল। ছায়ামূর্তি নিয়েই আলাপ চলতে লাগল।

মিঃ জাফরী কিন্তু কথার ফাঁকে বারবার শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। একটা সন্দেহের ঘন ছায়া তাঁর গোটা মনকে আচ্ছন্ন করে

ফেলেছিল। তিনি যেন ঐ কালো রঙের গাড়িখানাকেই একটু পূর্বে তার বাংলোর গেটের ভেতর থেকে অতি দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন। তবে কি শঙ্কর রাওয়ের মধ্যে কোন গোপন রহস্য লুকানো আছে? মিঃ চৌধুরীর মৃত্যুর দিনও শঙ্কর রাও তাঁর পাশে বসে খাচ্ছিলেন। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুক্ষণে মিঃ রাওয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল লক্ষ্য করেছিলেন মিঃ জাফরী। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের সম্বন্ধেও মিঃ রাওয়ের মনোভাব খুব স্বচ্ছ ছিল না। প্রায়ই মিঃ রাও জয়ন্ত সেন সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহজনক কথাবার্তা বলতেন। ভগবৎ সিং বৈশি দস্যু নাথুরামের সম্বন্ধে অবশ্য মিঃ শঙ্কর রাও কোনরকম মন্তব্য করেননি, তবু তার সঙ্গেও যে তার কোন ভালো ভাব ছিল তাও নয়। মিঃ জাফরী গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন ছায়ামূর্তি কে হতে পারে এবং পর পর কেনই বা সে এই তিন তিনটে খুন করল?

অনেক সন্ধান করেও ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না কেউ। সবার বিদায় গ্রহণ করার পরও মিঃ জাফরী চিন্তমুক্ত হলেন না, রাত্রে চারটা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু নিদ্রাদেবী কিছুতেই তাঁর কাছে আসতে চাইলেন না।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললেন মিঃ জাফরী।

শহরের শেষ প্রান্তে নির্জন স্থানে এই বাংলোখানা। বাংলোর সম্মুখের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যায় শহরের বড় বড় দালানকোঠা আর ইমারত। ছবির মত সুন্দর একটা শহর। আর পেছন বারান্দায় ফিরে দাঁড়ালে নজরে পড়ে বিস্তৃত প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপঝাড় আর আগাছায় ভরা টিলা।

মিঃ জাফরীর মাথায় চিন্তার জাল জট পাকাচ্ছিল। পাশের টেবিলে রাখা এ্যাসট্রেটা অর্ধদগ্ধ সিগারেটে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি ভাবছিলেন, এলেন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য। দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে তিনি পুলিশমহলে স্বনামধন্য হবেন, কিন্তু তিনি জড়িয়ে পড়লেন ছায়ামূর্তির বেড়াজালে।

মিঃ জাফরীর সিগারেটের ধুয়া কক্ষটার মধ্যে একটা ধূম্রকুণ্ডলির সৃষ্টি করছিল। সামনের দরজা বন্ধ থাকলেও পেছনের জানালা মুক্ত করে দিয়েছিলেন মিঃ জাফরী। কারণ বন্ধ হওয়ায় নিঃশ্বাস বদ্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

মিঃ জাফরী গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছেন, এমন সময় ঠিক তাঁর শিয়রে খট্ করে একটা শব্দ হল। কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছিল, স্বল্পালোকে ফিরে তাকালেন মিঃ জাফরী। সঙ্গে সঙ্গে শিয়রে রাখা রিভলভারে হাত দিতে

গেলেন, কিন্তু তার পূর্বেই চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাঁর কানে—রিভলবারে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না।

ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন মিঃ জাফরী। ডিমলাইটের স্বল্পালোকে দেখলেন একটা জমকালো ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর শিয়রের কাছে। হাতে তার উদ্যত রিভলভার। আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির হাতের রিভলভারখানা চক্‌চক্‌ করে উঠল। ছায়ামূর্তির সমস্ত শরীর জমকালো আলখেল্লায় ঢাকা।

মিঃ জাফরী ভয় পাবার লোক নন, তিনি গর্জে উঠলেন— কে তুমি?

পূর্বের ন্যায় চাপা কণ্ঠস্বর—আমার নাম ছায়ামূর্তি।

কি তোমার উদ্দেশ্য? জানো আমি তোমায় গ্রেফতারের জন্য অহরহ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি?

জানি। কিন্তু ছায়ামূর্তিকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করেছ ঠিক তত নয়। এখনও বলছি, ফিরে যাও জাফরী।

না, আমি এই খুনের রহস্য ভেদ না করে ফিরে যাব না। কে তুমি—আমাকে জানতে হবে।

হাঃ হাঃ হাঃ, ছায়ামূর্তির আসল রূপ তুমি দেখবে? কিন্তু তুমি আমার আসল চেহারা দেখলে শিউরে উঠবে। ওপরের খোলসের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর আমার ভেতরের চেহারা।

যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন, ভয় পাই না আমি। জাফরী কোনদিন ভয়ঙ্কর দেখে ভয় পায় না। কথার ফাঁকে মিঃ জাফরী পুনরায় তাঁর রিভলভারে হাত দিতে যান।

কিন্তু তার পূর্বেই ছায়ামূর্তি মিঃ জাফরীর রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়েছে। এবার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ছায়ামূর্তি গর্জে ওঠে— আলেয়ার পেছনে ছুটাছুটি না করে সত্যের সন্ধান কর। তাহলেই সব জানতে পারবে।

মিঃ জাফরী কিছু বলার পূর্বেই ছায়ামূর্তি খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বাইরে।

মিঃ জাফরী চিৎকার করে ডাকলেন— দারোয়ান, দারোয়ান--- সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে -হ্যালো! হ্যালো পুলিশ অফিস? আমি মিঃ জাফরী, ডাকবাংলো থেকে বলছি। আপনি মিঃ হারেস? --- এই মাত্র আমার কক্ষে ছায়ামূর্তি এসেছিল--- মিঃ হারুন অফিসে নেই?---

ওপাশ থেকে ভেসে আসে মিঃ হারেসের ভীত কণ্ঠস্বর—আমি ইন্সপেক্টার সাহেবকে ফোন করছি। তাঁকে সঙ্গে করে কি ডাকবাংলোয় আসব?

আসতে আর হবে না। ছায়ামূর্তি ভেগেছে।

কি করবো তাহলে স্যার?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি তাঁকে ফোন করে দিন। এক্ষুণি এখানে আসতে বলুন তাঁকে, আপনিও কয়েকজন পুলিশ নিয়ে চলে আসুন।

মিঃ হারুন সংবাদটা শোনামাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন- মিঃ জাফরীর কক্ষে ছায়ামূর্তি!

তৎক্ষণাৎ পুলিশ ফোর্সসহ মিঃ জাফরীর বাংলোয় ছুটলেন মিঃ হারুন।

বাংলোর চারপাশে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও ছায়ামূর্তির কোন খোঁজ বা চিহ্ন পাওয়া গেল না।

গোটা রাত অনিদ্রায় কাটালেন মিঃ জাফরী। সঙ্গে মিঃ হারুন ও তাঁর দলবলসহ জেগে রইলেন।

মিঃ জাফরী একসময় মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন- দেখুন মিঃ হারুন, এই ছায়ামূর্তি রহস্যটা ক্রমেই চক্রজাল বিস্তার করছে। আপনি গোপনে সমস্ত শহরের আনাচে কানাচে সি. আই. ডি. পুলিশ নিযুক্ত করে দিন।

স্যার, আপনার কথামত সি. আই. ডি. পুলিশ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা আজও এই ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে কোন রকম রিপোর্ট পেশ করতে সক্ষম হননি।

আশ্চর্য সাহস এই ছায়ামূর্তির—আপনার কক্ষে যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া বাংলোর চারপাশে কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও সে কেমন করেই বা প্রবেশ করল! কথাগুলো বললেন মিঃ জাহেদ।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ পুলিশ অফিস থেকে বড় দারোগা মিঃ জসীম ফোন করলেন।

টেবিলের ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠতেই মিঃ হারুন হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন, রিসিভার তুলে নিলেন হাতে - হ্যালো, স্পিকিং মিঃ হারুন। কি বলেন, ছায়ামূর্তি পুলিশ-অফিসে ...

কক্ষে সকলেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন মিঃ হারুনের দিকে। মিঃ জাফরী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন- পুলিশ অফিসে ছায়ামূর্তি..... ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে গিয়েছিল। এই নিন স্যার- রিসিভারখানা মিঃ জাফরীর হাতে দেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী ফোনে মুখ রেখে গুরুত্ব গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন—কি বলছেন আপনি! ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে প্রবেশ করেছিল?

ওপাশ থেকে ভেসে আসে মিঃ জসীমের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর–হাঁ স্যার। আমি ও আর দু'জন পুলিশ ছিলাম, কিন্তু ছায়ামূর্তির দু'হাতে দুটো রিভলভার ছিল।

সে কি করেছে? পুলিশ অফিসে তার কি প্রয়োজন ছিল?

সে ডায়েরীখানা নিয়ে কি যেন সব দেখল। দু'খানা ছবিও সে নিয়ে গেছে।

ছবি! কিসের ছবি? কার ছবি? মিঃ জাফরী গর্জে ওঠেন।

মিঃ জসীমের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর– স্যার, দাগীর ছবি। দুটো দাগী বদমাইশের ছবি নিয়ে গেছে ছায়ামূর্তি।

বলেন কি!

হ্যাঁ স্যার, অদ্ভুত কাণ্ড।

মিঃ জাফরী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন—এখন ভোর সাড়ে চারটা। আমরা এক্ষুণি পুলিশ অফিসে আসছি।

আসুন স্যার। অফিসে আমরা সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

মিঃ জাফরী রিসিভার রেখে উঠে পড়েন। মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বলেন—এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যেতে হবে।

অন্য সবাই মিঃ জাফরীর সঙ্গে উঠে পড়লেন।

□

পুলিশ অফিসে পৌঁছে মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য অফিসার বিস্মিত ও হতবাক হলেন। ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসের সমস্ত খাতাপত্র তচনচ করে ডায়েরীর পাতা খুঁজে বের করেছে এবং দুটো ছবি নিয়ে গেছে।

ছায়ামূর্তির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হলেন। অফিসের ডায়েরী খাতায় সে কিসের সন্ধান করেছে? দাগীদের দু'খানা ফটোই বা সে কি করবে, ভেবে কেউ সঠিক জবাব খুঁজে পেলেন না।

ছায়ামূর্তিকে নিয়ে গভীর আলোচনা শুরু হল। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল, যে দু'খানা ফটো অফিস থেকে হারিয়েছে তার একটা দস্যু নাথুরামের এবং অন্যটা শয়তান মুরাদের।

ব্যাপার ক্রমেই জটিল হচ্ছে।

মিঃ জাফরী গভীর চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন।

ইতোমধ্যে মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম এসে পুলিশ অফিসে হাজির হয়েছেন। মিঃ আলমের চোখে মুখেও উৎকণ্ঠার ছাপ। পুলিশ অফিসে হানা দেয়া। এ কম কথা নয়! ছায়ামূর্তির দুঃসাহস ক্রমে বেড়েই চলেছে।

মিঃ জাফরী বহুক্ষণ নিশ্চুপ চিন্তা করার পর বললেন– ছায়ামূর্তি যেই হউক সে শিক্ষিত।

আপনার অনুমান সত্য স্যার। ছায়ামূর্তির আচার ব্যবহারে তাকে অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। মিঃ আলম বললেন।

মিঃ জাফরী ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন– শুধু চতুর আর বুদ্ধিমানই সে নয় মিঃ আলম– অত্যন্ত ধূর্ত।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– এই ছায়ামূর্তি মুরাদ ছাড়া অন্য কেউ নয়। সে একদিকে যেমন শিক্ষিত তেমনি বুদ্ধিমান। বিলাতে কত বছর কাটিয়ে এসেছে। শিয়ালের মত ধূর্ত সে।

হ্যাঁ স্যার, সেই যদি না হবে তবে নাথুরাম এবং মুরাদের ফটো সে নিয়ে যাবে কেন! মিঃ জাহেদ বললেন।

ছায়ামূর্তি নিয়ে যখন গভীর আলোচনা চলছিল ঠিক সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন মুরাদের পিতা খান বাহাদুর সাহেব। কক্ষস্থ সবাই হঠাৎ এই ভোরবেলায় খান বাহাদুর সাহেবকে হন্তদন্ত হয়ে অফিসে প্রবেশ করতে দেখে আশ্চর্য হলেন।

আজ তাঁকে ছন্নছাড়ার মত লাগছিল। তেলবিহীন উস্কখুস্ক সাদা চুলগুলো এলোমেলো, ঘোলাটে চোখে বেদনার সুস্পস্ট ছাপ, মুখমণ্ডল বিষণ্ন –উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত ভাব।

কক্ষস্থ সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন।

মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন– ব্যাপার কি খান বাহাদুর সাহেব?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন খান বাহাদুর সাহেব—একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

দুর্ঘটনা! আপনার না আপনার পুত্রের? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হারুন।

আমার! আমার ইন্সপেক্টর, আমার। পুত্রের আমি কোন ধার ধারি না। সে মরলেও আমার ক্ষতি নেই, বাঁচলেও আমার লাভ নেই।

তবে আপনার কি দুর্ঘটনা ঘটল?

কি বলব ইন্সপেক্টার সাহেব, কি বলব-- ধপ্ করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়েন খান বাহাদুর সাহেব, তারপর ঘোলাটে চোখে একবার কক্ষের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন– যে ছায়ামূর্তি নিয়ে আপনারা উতলা হয়ে পড়েছেন, সেই ছায়ামূর্তি আজ আমার ওপর হামলা চালিয়েছিল।

কক্ষে যেন বাজ পড়ে।

মিঃ জাফরী বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠেন ছায়ামূর্তি।

হ্যাঁ জনাব। আজ ক'দিন আমার মনের অবস্থা ভালো নেই, একমাত্র সন্তানের জ্বালায় আমি তো পাগল হয়ে গেছি।

এখনও হননি। আরও হবেন। গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলেন মিঃ আলম।

সত্যি, আমার ওকে নিয়ে কি যে যন্ত্রণা! ওর চিন্তায় ঘুম নেই চোখে। সারাটা রাত অনিদ্রায় কাটে। আজও তেমনি গোটা রাত দুশ্চিন্তায় ছটফট করেছি। ভোর পাঁচটা কিংবা সাড়ে পাঁচটা হবে, আমি শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরুতে যাব, এমন সময় হঠাৎ আমার সম্মুখে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

কক্ষস্থ সবাই থ' মেরে শুনছেন।

খান বাহাদুর সাহেবের চোখেমুখে ভীতি ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন– আমি ছায়ামূর্তি দেখে চিৎকার করতে যাব অমনি তার হাতের রিভলভারে নজর পড়তেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার। ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম– তুমি কে? অদ্ভুত মূর্তিটা জবাব দিল, আমি ছায়ামূর্তি। হঠাৎ খান বাহাদুর সাহেব কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলেন– ইন্সপেক্টার সাহেব, ছায়ামূর্তি আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে।

আচ্ছা, ঘটনাটা আগে বিস্তারিত বলুন! বললেন মিঃ জাফরী।

সে আমার কাছে এক লাখ টাকা চেয়ে বসল। না হলে আমাকে সে হত্যা করবে বলে ভয় দেখাল।

তারপর?

আমি কি করি বলুন? জীবনের ভয় কার না আছে? বারবার দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম, ভাবলাম—বয়টা এতক্ষণও আসে না কেন? কারণ, আমার একটা বয় আছে, সে খুব সকালে উঠে আমাকে মুখহাত ধোয়ার পানি দিত এবং চা তৈরি করে দিত। আশ্চর্য ইন্সপেক্টার সাহেব, ছায়ামূর্তিটা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল। সে চাপাকণ্ঠে বলল— ওরা এখন কেউ আসবে না খান বাহাদুর সাহেব।

শেষ পর্যন্ত কি করলেন আপনি? এবার প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

কি করবো, লাখ টাকা দিয়ে ছায়ামূর্তিকে বিদায় করলাম। কিন্তু আমি কি করব ইন্সপেক্টার, আমার সর্বস্ব সে নিয়ে গেছে.....

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– ঘাবড়াবেন না খান বাহাদুর সাহেব, এটাও আপনার গুণধর পুত্র মুরাদের কারসাজি।

মিঃ হারুনের দিকে তাকান খান বাহাদুর সাহেব– তার মানে?

মানে ছায়ামূর্তির বেশে আপনার পুত্রই আপনার লাখ টাকা হস্তগত করেছে।

না না, সে গলা মুরাদের নয়।

আপনি বুঝতে পারছেন না খান বাহাদুর সাহেব, একটা যন্ত্র আছে সেটা মুখে পরলে তার কণ্ঠস্বর কেউ চিনতে পারবে না বা পারে না।

আপনারা বলতে চান সেই ছায়ামূর্তি আমার ছেলে মুরাদ?

অসম্ভব নয় খান বাহাদুর সাহেব। আপনার পুত্রের নিরুদ্দেশের পেছনে বিরাট একটা রহস্য আছে। সেই রহস্যকে কেন্দ্র করেই এই তিনটে খুন সংঘটিত হয়েছে। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী এতক্ষণ গম্ভীরভাবে সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি সোফায় ভাল হয়ে বসে বললেন–মিঃ হারুন, ছায়ামূর্তি যে খান বাহাদুর সাহেবের পুত্র মুরাদই এটা আপনি সঠিক করে বলতে পারেন না। কারণ ছায়ামূর্তির পেছনে একটা চক্রজাল বিস্তার করে রয়েছে। কে ছায়ামূর্তি – কেউ জানে না।

খান বাহাদুর সাহেব মিঃ জাফরীর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল। হাজার দোষে দোষী হউক তবু সে পুত্র। পিতামাতার নিকটে পুত্র-কন্যা যতই অপরাধী হউক না কেন, তবু তারা ক্ষমার পাত্র। খান বাহাদুর সাহেব কতকটা যেন আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হল। কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভুলে গেলেন লাখ টাকার কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাঁর টাকার কথা মনে হলো তখনই তিনি হা হুতাশ করে উঠলেন– আমার লাখ টাকার কি হবে ইন্সপেক্টার সাহেব? আর কি ও টাকা পাব না?

দুরাশা খান বাহাদুর সাহেব, যে টাকা হারিয়ে যায় তা ফেরত পাওয়া দুরাশা মাত্র— মিঃ আলম শান্তকণ্ঠে বললেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– সে কথা সত্য। হারিয়ে যাওয়া কিংবা চুরি যাওয়া জিনিস কদাচিৎ ফেরত পাওয়া যায়।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ওঠেন– খান বাহাদুর সাহেবের লাখ টাকা আর ফেরত আসবে না এটা সত্য। কারণ, ছায়ামূর্তি অতি বুদ্ধিমান। তারপর খান বাহাদুর সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– আপনার কেসটা ডায়েরী করে যান, আমরা আপনার টাকা উদ্ধার ব্যাপারে চেষ্টা করে দেখব।

খান বাহাদুর সাহেব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

মিঃ হারুন নিজে খান বাহাদুর সাহেবের কেসটা ডায়েরী করে নিলেন।

❑

রৌদ্রদগ্ধ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিল মনিরা। মরিয়ম বেগম আজ বাড়ি নেই, কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বহুদিন তিনি বাড়ির বাইরে যাননি। বিশেষ করে চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর মরিয়ম বেগম একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, নিজের ঘর ছেড়ে তিনি একরকম বেরই হন না। মনিরাই তাঁকে অনেক বলে কয়ে পাঠিয়েছে। যাও মামীমা, খালাম্মাদের বাড়ি থেকে আজ একটু বেড়িয়ে এসো– বলেছিল মনিরা।

মরিয়ম বেগম ম্লান হেসে বলেছিলেন– ওসব আর ভাল লাগে না মা। যেখানেই যাই না কেন, শূন্য শূন্য মনে হয়। সে যে আমার সব নিয়ে গেছে।

মনিরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল–মামীমা, এভাবে নিজকে নিঃশেষে করে আর কি হবে! তিনি বেহেস্তের মানুষ, বেহেস্তে চলে গেছেন। ডাক এলে তুমি আমি সবাই যাব।

মনিরা মামীমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল বটে কিন্তু তার হৃদয়েও মামুজানের বিরহ-বেদনা তুষের আগুনের মতই ধিকি ধিকি জ্বলছিল। মনের সমস্ত বেদনাকে চাপা দিয়ে আজকাল মনিরা নিজেকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করত, বিশেষ করে মামীমার জন্য তাকে একটু শক্ত হতে হয়েছে। মনিরা প্রথম দিকে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারেনি। সব সময় সে নির্জনে বসে বসে কাঁদত। মামুজানই ছিল তাদের ভরসা।

কিন্তু মনিরা জ্ঞানবতী-শিক্ষিতা। সে দেখলো তার চোখের পানি শোকাতুরা মরিয়ম বেগমকে আরও শোকবিহ্বল করে তুলছে। কাজেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে মামীমাকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করতো।

আজ তাই মনিরা একরকম জিদ করেই মামীমাকে তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। তবু কিছুক্ষণের জন্য এই বদ্ধ হাওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। নানারকম কথাবার্তায় মনে আসবে পরিবর্তন।

মামীমাকে পাঠিয়ে মনিরা নিজের ঘরে বসে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ভাবছিল কত কথা। ছোট বেলায় পিতাকে হারানোর কথা, যদিও তার মনে নেই, কিন্তু বড় হয়ে যখন শুনেছিল তার আব্বা নেই, তখন একটা নিদারুণ ব্যথা তার শিশু অন্তরকে নিষ্পেষিত করে দিয়েছিল। তারপর মাকে হারানোর পালা। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও মনিরার হৃদয়ে হাতুড়ির ঘা পড়ে। সেদিন মনিরা নিজের জীবনকে একটা অপেয় জীবন বলে মনে করেছিল। তার মত অভাগী মেয়ে বুঝি আর এ জগতে নেই।

কিন্তু মামা-মামীমার অপরিসীম স্নেহ আর ভালোবাসার আবেষ্টনী মনিরার অন্তরের আঘাতকে সান্ত্বনার প্রলেপে একদিন ভরে তুলেছিল। হারানো পিতামাতার বঞ্চিত স্নেহনীড়, খুঁজে পেয়েছিল সে মামা আর মামীমার মধ্যে। তারপর মনিরা যখন তার স্নেহময় পিতা আর স্নেহময়ী মায়ের কথা কতকটা ভুলে এসেছে, এমনি সময় তার মাথায় বজ্রাঘাত হল, তার একমাত্র ভরসা মামুজান চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

অন্ধকারের অতলে যেন তলিয়ে গেলো মনিরা। বহুদিনের হারানো শোকে জেগে উঠল নতুন করে। সে ভেঙ্গে পড়েছিল– কিন্তু পরে নিজকে সামলে নিল। মামীমার করুণ ব্যথাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ চেপে গেল মনিরা নিজের মনে।

মামীমার মনকে স্বচ্ছ–স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল মনিরা। কারণ, এখন তার একমাত্র সম্বল ঐ বৃদ্ধা। সে ভাবল, হঠাৎ যদি তার মামীমার কিছু হয়ে যায় তখন কি হবে। তাকে আগলাবার এ দুনিয়ায় আর যে কেউ নেই।

মনির সে এখন অনেক দূরে। লোকসমাজ থেকে বহু দূরে। তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে। আলেয়ার আলোর মত তাকে দেখা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। মনিরের কথা ভাবছে মনিরা, এমন সময় গাড়ি বারান্দায় মোটর থামার শব্দ শোনা গেল। এ সময়ে কে এলো? মনিরা একটু সজাগ হয়।

কক্ষে প্রবেশ করে বাবলু– আপামনি, সেদিনের নতুন সাহেব এসেছেন। ঐ যে সাহেব আপনার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন।

বলে দে কেউ বাড়ি নেই। সোজা হয়ে বসে বলল মনিরা।

বাবলু বেরিয়ে গেল।

মনিরা আবার বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে বইখানা মেলে ধরল চোখের সামনে। কিন্তু বইয়ের পাতায় মন দিতে পারল না। হঠাৎ অসময়ে গোয়েন্দা মিঃ আলমের আগমন যেন তার সমস্ত চিন্তাধারাকে তচনচ করে দিয়ে গেল।

বাবলু ফিরে এলো—আপামনি, উনি আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে চান

মনিরার দু'চোখে ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠল, তীব্রকণ্ঠে বলল– বললি না, কেউ নেই?

বলেছি, কিন্তু উনি– বললেন– তোমার আপামনিও কি নেই? আমি বললাম তিনি আছেন, বই পড়ছেন। উনি তখন বললেন– আপনার সঙ্গেই....

ভাগ্ হতভাগা, আমি কারও সঙ্গে দেখা করব না।

কি বলব?

বল্‌গে আপামনি দেখা করতে পারবেন না।

আচ্ছা, তাই বলছি। বেরিয়ে যায় বাবলু।

একটু পরেই ফিরে আসে—আপামনি, উনি বলছেন খুব জরুরী কথা আছে, আপনার সঙ্গে দেখা না করলেই নয়।

মনিরা বিপদে পড়ল। অবশ্য মনিরার পক্ষে এ দেখা করা ব্যাপার তেমন কিছু নয়। কিন্তু আজ মনিরার মন ভাল ছিল না. তাছাড়া বাড়িতে আজ কেউ নেই, সরকার সাহেবও একটু আগে কোন কাজে গেছেন, নকিবটা রয়েছে, সেও রান্নাঘরে। যাক, ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। ভয় কি, তিনি তো আর এমন কোন লোক নন, একজন ভদ্রসন্তান। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কোন অসৎ ব্যবহার করবেন না। উঠে দাঁড়াল মনিরা– যা বলগে আমি আসছি। এই শোন্ ভেতরে বৈঠকখানায় বসাবি, বুঝলি?

বুঝেছি আপামনি। চলে যায় বাবলু।

ভেতর বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই মিঃ আলম মাথার ক্যাপটা খুলে মনিরাকে অভিবাদন জানালেন।

মনিরা শান্তকণ্ঠে বলল—বসুন।

একটু হেসে বলেন মিঃ আলম– অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে.....

না না, সময় আর অসময়ের কি আছে? যে অবস্থায় পড়েছি তাতে........

হাঁ, একটু বিরক্ত হতে হবে বৈকি। মনিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন— মিঃ আলম।

মিঃ আলম আসন গ্রহণ করার পরও মনিরা আসন গ্রহণ করে না। সে একপাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরে মিঃ আলমের মুখে।

মিঃ আলমও একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একরাশ ধোঁয়া সামনে ছুড়ে দিয়ে বললেন—মিস মনিরা, আমি আজ একটা জরুরী কথা জানতে এসেছি।

বেশ বলুন।

বসুন না, এমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বলুন কি জানতে চাচ্ছেন?

বসতে সঙ্কোচ করছেন– আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক বলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি?

না না বসছি। মনিরা মুখে সঙ্কোচ না করলেও মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। এই নির্জন দ্বিপ্রহরে একলা একজন যুবকের পাশে, তবু বাবলুটা রয়েছে বলে ভরসা হয় মনিরার। অবশ্য এ দুর্বলতার কারণ আছে। মনিরা এখন যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে সে অবস্থায় সবাই এমনি হবে। চারদিকে তার বিপদের বেড়াজাল। একদিন মনিরা সবাইকে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করত, কিন্তু আজ সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সবাই যেন আজ তাদের শত্রু, কেউ যেন তাদের মঙ্গল চায় না।

মিঃ আলম বললেন– কি ভাবছেন মিস মনিরা?

কই কিছু না। আপনি যা জিজ্ঞাসা করতে চান, করতে পারেন।

দেখুন মিস মনিরা, সবাই আপনাদের সম্বন্ধে যাই বলুক আমি তা বিশ্বাস করি না, মানুষের ধারণা এক কিন্তু ঘটনা অন্যরকম হয়। আমি পুলিশের রিপোর্টে জানতে পেরেছি আপনি দস্যু বনহুরকে ভালবাসেন এবং সেই কারণে দস্যু বনহুরও এখানে আসে–মানে আপনাদের এই বাড়িতে তার আগমন হয়।

এ কথাই কি আপনি জানতে এসেছেন?

না মিস মনিরা, আমি জানতে চাই, চারদিকে অন্ধের মত হাতড়ানোর চেয়ে আমরা অতি সহজেই চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য ভেদ করতে পারব, যদি আপনি সঠিক জবাব দেন।

হাঁ, তাকে আমি ভালবাসি।

আপনার মত উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে একটা নগণ্য দস্যুকে ভালবাসতে পারে, আশ্চর্য!

না, সে নগণ্য নয়। দস্যু সে হতে পারে কিন্তু হৃদয় তার অনেক বড়। আমার-আপনার মনের চেয়ে অনেক উঁচু তার মন।

ও, আপনি দেখছি তার প্রেমে একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত!

মনিরা নীরব।

বাবলু একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ মনিরা তাকে কক্ষে থাকার জন্য ইংগিত করেছিল।

মিঃ আলম বাবলুকে লক্ষ্য করে বললেন–এক গেলাস পানি নিয়ে এসো।

বাবলু বেরিয়ে গেল।

মনিরার বুকটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠল। বাবলু বেরিয়ে যাওয়ায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

মিঃ আলম একটু ঝুঁকে মনিরার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন–মিস মনিরা, আপনি সত্য কথা বললে আমি আপনাকে বাঁচিয়ে নিতে চেষ্টা করবো।

এ আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য। চৌধুরী সাহেবের হত্যার পেছনে দস্যু বনহুরের অদৃশ্য ইংগিত রয়েছে, এ কথা আপনি জানেন।

আপনার অনুমান মিথ্যা। আপনি যেতে পারেন, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব করব না। উঠে পড়ে মনিরা।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আলম মনিরার হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে–বসুন, আরও কথা আছে।

মনিরার হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মনিরা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ফোঁস্ করে ওঠে—হাত ছাড়ুন।

মিঃ আলম হাত ছেড়ে দেন, তারপর হেসে বলেন—মিস মনিরা, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। হঠাৎ ভুল হয়ে গেছে।

তীব্রকণ্ঠে বলে মনিরা–ভুল! ছিঃ আপনার মত...

হ্যাঁ, সত্যি আমি বড় অসভ্য।

মনিরা ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল মিঃ আলমের মুখের দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে মুখে নেই এতটুকু পরিবর্তন!

মনিরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে রি-রি করে উঠল। কোন কথা না বলে পুনরায় ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ল সে।

কিন্তু তখন মিঃ আলম উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, মুখে তাঁর মৃদু হাসির রেখা, টেবিল থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে মাথায় দিয়ে বলেন– মিস মনিরা, আমার যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। অসময়ে বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করবেন। আসি তবে...বেরিয়ে যান মিঃ আলম।

মনিরার দু'চোখে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল। রাগে-ক্ষোভে গজ্ গজ্ করছিল। মিঃ আলমের কথার কোন উত্তর দিল না সে।

গাড়ি-বারান্দা থেকে মোটর স্টার্টের শব্দ শোনা গেল। এমন সময় বাবলু ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করল। এক গ্লাস পানি আর প্লেটভরা নাস্তা। কক্ষের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলল-আপামনি, উনি কোথায়?

মনিরা কঠিন কণ্ঠে ধমক দিল—ভাগ্ হতভাগা!

বাবলু মনে করল, তার পানি আনতে দেরী হয়েছে, তাই রেগে গেছেন আপামনি। মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল–আপনি তো একদিন বলেছেন, কেউ পানি চাইলে যেন শুধু পানি এনে না দিই। তাই আমি......

মনিরা আর কথা না বলে উঠে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যায়। বাবলু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে মনিরার চলে যাওয়া পথের দিকে।

❑

মনিরা কক্ষে ফিরে এসেও স্বাভাবিক হতে পারে না। বারবার সে নিজের দক্ষিণ হাতখানা দুমড়ে-মুচড়ে, ঝেড়ে-মুছে ফেলে। এখনও তার হাতে যেন মিঃ আলমের হাতের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। ছিঃ ছিঃ এরাই দুনিয়ার সভ্য মানুষ। একটা মেয়েকে একলা নিঃসঙ্গ পেয়ে তাকে এভাবে অপদস্থ করতে পারে! এত সাহস তার হাতে হাত রাখে! অধর দংশন করে মনিরা।

এমন সময় মরিয়ম বেগম ফিরে আসেন বোনের বাড়ি থেকে।

সরকার সাহেবও এসে পড়েন।

মনিরার রাগ যেন আরও বেড়ে যায়। এতক্ষণ কেউ আসতে পারেনি? এমন কি সরকার সাহেব থাকলেও মনিরা কিছুতেই যেত না মিঃ আলমের সঙ্গে দেখা করতে।

মরিয়ম বেগম মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলেন—মা মনি- মনিরা এগিয়ে এলো—কি বলছ মামীমা?

শুনলাম মিঃ আলম এসেছিল?

হ্যাঁ, এসেছিলেন।

কি বললেন তোকে?

জানি না!

সেকি, তিনি কেন এসেছিলেন, কি জিজ্ঞাসা করলেন বলবি না?

নতুন কোন কথা নয়, সেদিন তিনি যা প্রশ্ন করেছিলেন আজও তাই করছিলেন। আমাকে ফুসলিয়ে তিনি জানতে এসেছিলেন মামুজানের হত্যারহস্য আমি জানি কিনা।

মরিয়ম বেগম আজ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে রাগত কণ্ঠে বললেন–ভদ্রলোকের সন্দেহের সীমা নেই দেখছি। এবার ঐরকম কোন প্রশ্ন করলে সোজা বলে দিবি–আমি কোন জবাব দেবো না।

মনিরা বলে উঠে—এরপরও আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব– কখ্খনো না। মামীমা, আজ তার যা আচরণ পেয়েছি, তা বলতে লজ্জা হয়। সে আমার হাত ধরে বসিয়ে দিতে যায়—এত সাহস তার!

মনিরার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

মরিয়ম বেগম মনিরাকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন–কি করবি মা, সবই আমাদের অদৃষ্ট। আজ তোর মামুজান বেঁচে থাকলে কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে সাহসী হত না। আর আজ....মনিরা, মা আমার, কি বলব, আজ সবাই আমাদের অবহেলা করে, হেয় মনে করে.... মরিয়ম বেগম আঁচলে অশ্রু মুছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন তিনি–মনি, একটা কথা বলব তোকে?

প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকায় মনিরা মামীমার মুখের দিকে।

আয় মা, আমার ঘরে আয়।

মনিরা মামীমাকে অনুসরণ করে। না জানি কি বলতে চান তিনি। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন একসঙ্গে আলোড়ন জাগায়। মামীমাই এখন তার একমাত্র অভিভাবক। তিনি যা বলবেন তাই করতে হবে। যা বলবেন তাই শুনতে হবে।

মামীমার কক্ষে প্রবেশ করে মুখোমুখি বসল দু'জন। মরিয়ম বেগম ভাগ্নীর কপালের এলোমেলো চুলগুলো সযত্নে সরিয়ে দিয়ে বললেন— মনি এখন তুমি অনেক বড় হয়েছে। শিক্ষিত মেয়ে তুমি। তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না আমার, এখন তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে।

মনিরার মনটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠল। কি বলতে চান মামীমা।

মরিয়ম বেগম একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—যা ভেবেছিলাম তা হবার নয়। বড় আশা ছিল, তোকে কাছে ধরে রাখবো! কিন্তু হল না---- মনির আমার সব আশা-ভরসা নষ্ট করে দিয়েছে।

মনিরার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হল। সরল সহজ মামীমাকে আজ এত ভূমিকা করতে দেখে বুঝতে কিছু বাকি থাকে না মনিরার।

মরিয়ম বেগম বলে চলেন–খালেদার ছেলেটা এবার ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে মস্তবড় চাকরি পেয়েছে। দেখতে শুনতে খুব সুন্দর। আমারই বোনের ছেলে তো-আমার মনিরের মতই তার চেহারা।

মনিরার মুখমণ্ডল মুহূর্তে কালো হয়ে উঠল। জলভরা আকাশের মত ছলছল করে উঠল তার চোখ দুটো। অসহায়ার মত তাকাল সে মামীমার মুখের দিকে।

মনিরার হৃদয়ের ব্যথা বুঝতে পারেন মরিয়ম বেগম। তাঁর নিজের মনেও কি কম দুঃখ! কোনদিন যে মনিরাকে দূরে সরাবেন, এ কথা মরিয়ম বেগম ভাবতেই পারেননি। তাঁর মন আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে। মনিরাকে যে পরের ঘরে পাঠাতে হবে, এ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে।

মনিরা সম্বন্ধে মরিয়ম বেগম যে চিন্তা করেননি তা নয়। অনেকদিন নিরালায় বসে ভেবেছেন, মনিরা এখন ছোট নেই। তার বয়সে মরিয়ম বেগমের কোলে মনির এসে পড়েছিল। কাজেই এখন আর নিশ্চুপ থাকার সময় নয়। মনিরা সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা না করলেই চলবে না।

একমাত্র সন্তান মনির—কিন্তু সে আজ লোকসমাজের বাইরে। তার সঙ্গে মনিরার বিয়ে হওয়া অসম্ভব। নিজে যে দুঃখ, যে বেদনা অহরহ ভোগ করেছেন, সে জ্বালা আর একটা অবলা সরলা মেয়ের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না তিনি।

তাই আজ মনস্থির করে ফেলেছেন মনিরার বিয়ে দেবেন অন্য একটা ছেলের সঙ্গে। বোন খালেদার ছেলেকে দেখে আজ তাঁর হৃদয়ে সেই বাসনাটা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। উপযুক্ত ছেলে কাওসার–মনিরার সঙ্গে সুন্দর মানাবে। যেমন চেহারা তেমনি তার ব্যবহার।

মরিয়ম বেগম কাওসারকে ছোটবেলায় দেখেছিলেন—ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মনির আর কাওসারকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন মরিয়ম বেগম-দেখ খালেদা, এদের দু'জনকে দেখলে ঠিক যেন যমজ ভাই বলে মনে হয়।

হেসে বলেছিল খালেদা–তোমার ছেলে আর আমার ছেলে যে এক হবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে। কাওসার তো তোমারই ছেলে আপা!

সেই কাওসার আজ উচ্চশিক্ষা লাভ করে মানুষের মত মানুষ হয়েছে, আর তার মনির আজ কি হয়েছে?–লোকসমাজে তার কোন স্থান নেই!

মনিরা নিশ্চুপ। পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

মরিয়ম বেগম গভীর স্নেহে টেনে নিলেন ওকে কাছে–মা, জানি তুই ঐ হতভাগাকে ভালবাসিস্। কিন্তু... সে আমার সন্তান হলে কি হবে, ওর হাতে আমি তোকে তুলে দিতে পারব না। না না, কিছুতেই তা সম্ভব নয়। মনিরা

বল্ আমার কথা রাখবি। আমি খালেদাকে কথা দিয়ে এসেছি, কাওসারের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব....

মামীমা! আর্তস্বরে বলে ওঠে মনিরা।

হ্যাঁ, আমি তোকে পরের হাতে সঁপে দিতে পারব তবু তোর ফুলের মত জীবনটাকে বিনষ্ট করতে পারব না।

মামীমা, তুমি জানো না....

সব জানি মনিরা সব জানি। কিন্তু কোন উপায় নেই। মনিরকে তোর ভুলতে হবে।

মামীমা!

আমি পাষাণের চেয়েও কঠিন হবো। যত আঘাতই আসুক না কেন, সব আমি সহ্য করব। হঠাৎ মরিয়ম বেগম চিৎকার করে ডাকেন- সরকার সাহেব, সরকার সাহেব!

হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন সরকার সাহেব–আমায় ডাকছেন বিবি সাহেবা?

হ্যাঁ। শুনুন সরকার সাহেব, আমি মনিরার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। আমার চাচাতো বোন খালেদার ছেলে কাওসারের সঙ্গে। আপনি বিয়ের সব আয়োজন করুন।

আচ্ছা বিবি সাহেবা। কবে থেকে বিয়ের আয়োজন শুরু করব?

কাল। কাল থেকেই আপনি কাজ শুরু করুন। বাড়িঘর সমস্ত হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে নিন। দরজা জানালা সব নতুন রঙ করাবেন। পুরানো পর্দা সরিয়ে নতুন পর্দার ব্যবস্থা করুন! চৌধুরী সাহেব মরে গেছেন বলে আমিও মরিনি। আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ে মনিরা চোখের পানি ফেলবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। ওকে যদি আমি সুখী করতে না পারি তাহলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

ওর মা মৃত্যুকালে ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গেছে–মনিরাকে সুখী করো ভাবী। রওশন আরার সেই মৃত্যুকালের শেষ কথা আমি কোন দিন ভুলব না। নিজের সুখ-সুবিধার জন্য ওকে আমি সাগরে ভাসাতে পারি না

সরকার সাহেব মাথা দোলালেন—আপনি ঠিক বলেছেন বিবি সাহেবা, এখন মা মনির বিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। পাড়া-প্রতিবেশীরা এ নিয়ে অনেক কথাই বলে, তাদের মুখে যেন কালি পড়ে।

পাড়া-প্রতিবেশীদের কথাবার্তা শুনে শুনে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে। মেয়ে বড় হয়েছে আমার হয়েছে তাতে অন্যের কি? চৌধুরী সাহেব

বেঁচে থাকতে যারা 'টু' শব্দটি করতে সাহসী হয়নি, আজ তারা আমাদের সম্বন্ধে যা-তা বলতে শুরু করেছে। যাক, এবার আমি সকলের কথার শেষ করব; মনিরার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

মরিয়ম বেগম মুখে যতই বলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি মনিরাকে খালেদার ছেলে কাওসারের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেন না। মনকে যতই কঠিন করবেন ভেবেছিলেন সব ভেসে গেলো—অদৃশ্য মায়ার বন্ধন মরিয়ম বেগমের সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তিনি সব ছাড়তে পারেন কিন্তু মনিরাকে ত্যাগ করতে পারেন না।

পরদিন ভোরে নামাযান্তে সরকার সাহেবকে ডেকে বললেন–মনিরার বিয়ে আমি দেব না সরকার সাহেব। অযথা ঘরদোর নতুন করে সাজাবার আমার কোন দরকার নেই।

সরকার সাহেব সব বুঝতে পেয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর চলে গেলেন নিজের কাজে।

❑

বনহুরের মাথায় পাগড়ীটা পরিয়ে দিয়ে হেসে বলল নূরী—জানি তুমি ছায়ামূর্তির সন্ধানে চলেছ।

হ্যাঁ নূরী, পুলিশমহল যে ছায়ামূর্তির সন্ধানে ঘাবড়ে উঠেছে—আমি তাকে খুঁজে বের করতে চাই।

সত্যি হুর, বড় আশ্চর্য! কে এই ছায়ামূর্তি? ছায়ামূতি যে অত্যন্ত চালাক এবং ধূর্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সে কারণেই তো আজও পুলিশ তাকে গ্রেফতারে সক্ষম হয়নি।

তুমি কোথায় পাবে তার সন্ধান?

দস্যু বনহুরের চোখে ধুলো দিতে পারে এমন ছায়ামূর্তি আছে? নূরী, ছায়ামূর্তি যেই হোক, আমি তাকে পাকড়াও করবোই। কিন্তু সাবধান, ছায়ামূর্তি যেন এখানে এসে হাজির না হয়।

হেসে বলে নূরী–হুর, তোমার আস্তানায় আসাবে ছায়ামূর্তি? এত সাহস হবে তার? সিংহের গহ্বরে শৃগালের প্রবেশ----

আচ্ছা, আমি চললাম। খোদা হাফেজ! বনহুর নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর চলে যেতে নূরী ফিরে দাঁড়ায়, বনহুরের পরিত্যক্ত শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে। মনের কোণে ভেসে ওঠে বনহুরের সুন্দর মুখখানা। কানের কাছে ভাসে তার কণ্ঠস্বর।

নূরী উঠে বনহুরের ছোরাখানা তুলে নেয় হাতে, বুকে চেপে ধরে অনুভব করে তার স্পর্শ।

হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হয়! চমকে ফিরে তাকায় নূরী। মুহূর্তে তার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়।

নূরী দেখতে পায়, একটা অদ্ভুত কালো আলখেল্লায় সমস্ত শরীর ঢাকা ছায়ামূর্তি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

নূরী হতবাকের মত তাকিয়ে থাকে।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে।

নূরী চিৎকার করে ওঠে—কে তুমি?

ছায়ামূর্তি! চাপা অস্ফুট কণ্ঠে বলে ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তি তুমি! কি চাও এখানে?

আমি জান নিতে এসেছি।

জান?

হ্যাঁ, তোমার নয়–দস্যু বনহুরের।

নূরী দু'পা সরে দাঁড়ায়, সাহস সঞ্চয় করে বলে–শয়তান, জানো তুমি কোথায় এসেছ?

দস্যু বনহুরের বিশ্রামকক্ষে।

এখানে তুমি কেমন করে প্রবেশ করলে?

ছায়ামূর্তির প্রবেশ সর্বক্ষণ সর্বস্থানে অতি সহজ.... একটু থেমে বলে ছায়ামূর্তি–এতক্ষণ তোমার আর দস্যু বনহুরের মধ্যে যে কথাবার্তা হলো সব আমি শুনেছি!

শয়তান! তবে কার ভয়ে লুকিয়ে ছিলে। তখন এখানে প্রবেশ করতে পারলে না? দস্যু বনহুর তোমায় উচিত সাজা দিয়ে তবেই ছাড়ত! এসেছ একটা নারীর কাছে বাহুবল দেখাতে? নূরী দ্রুত পদক্ষেপে দরজার সম্মুখে গিয়ে হাতের ছোরাখানা বাড়িয়ে ধরে–খবরদার, এক-পা এগুলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

ছায়ামূর্তি চাপাস্বরে হেসে ওঠে—হাঃ হাঃ হাঃ ছায়ামূর্তিকে তুমি হত্যা করবে? এসো তবে–ছায়ামূর্তি এগুতে থাকে নূরীর দিকে।

ক্রুদ্ধ নাগিনীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করছিল নূরী। রুখে দাঁড়ায়-শয়তান! সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা বসিয়ে দিতে যায় সে ছায়ামূর্তির বুকে।

মুহূর্তে ছায়ামূর্তি নূরীর হাতখানা বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় চেপে ধরে। অতি সহজেই নূরীর হাত থেকে ছোরাখানা খসে পড়ে মেঝেতে।

এবার হাত ছেড়ে দেয় ছায়ামূর্তি, তারপর আবার সে হেসে ওঠে অট্টহাসি।

নূরী থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছায়ামূর্তি হাসি থামিয়ে বলে—বনহুরের জীবন যদি বাঁচাতে চাও, তবে তাকে আমার অন্বেষণ থেকে ক্ষান্ত কর। নচেৎ আবার আসব .....কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নূরী ছুটে গিয়ে বিপদ সংকেত ঘণ্টাধ্বনি করে।

মুহূর্তে সমস্ত দস্যু এসে জড়ো হয় নূরীর চারপাশে।

নূরী সকলকে লক্ষ্য করে বলে-ছায়ামূর্তি! এই মুহূর্তে এখানে ছায়ামূর্তি এসেছিল— যাও, তোমরা শিগগির তার অনুসন্ধান কর। যাও।

সমস্ত অনুচরের চোখেমুখে বিস্ময় ঝরে পড়ল-আশ্চর্য! তাদের এত সাবধানতা সত্ত্বেও কি করে এখানে ছায়ামূর্তি প্রবেশ করলো! সবাই ছুটলো চারদিকে। আস্তানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

❑

ভোরের দিকে তাজের পদশব্দে নূরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

গোটারাত নূরীর নিদ্রা হয়নি, এই অল্পক্ষণ সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাজের শব্দ তার অতি পরিচিত। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে ছুটে গেল সে বনহুরের কক্ষে।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করেই নূরীকে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হল, হেসে বলল-এখনও ঘুমোওনি নূরী?

নূরী তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে—হুর, জানো কি ঘটেছে? তুমি যা বলেছিলে তাই?

কি বলেছিলাম?

ছায়ামূর্তি! সেই ছায়ামূর্তি এসেছিল.....

ছায়ামূর্তি এসেছিল, বল কি নূরী!
হ্যাঁ, কি ভয়ঙ্কর তার চেহারা। তেমনি অসুরের মত শক্তি তার দেহে।
তার চেহারাও দেখেছ। তার শক্তিও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে দেখছি।
সব বলছি হুর, শোনো। সে তোমার জীবন নিতে এসেছিল!
আমার জীবন?
হ্যাঁ, তোমার জীবন। তুমি যদি ছায়ামূর্তির অনুসন্ধানে ক্ষান্ত না হও, তবে—
আমার জীবন নেবে সে—এই তো?
আমি ওকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমার হাত মুঁঠায় চেপে ধরে....
ছোরাখানা কেড়ে নিয়েছে—এই তো?
তুমি ঠাট্টা করছ হুর! আমার ভয় হচ্ছে, শয়তানটা তোমার না কিছু করে বসে।
ভয় নেই নূরী, ছায়ামূর্তির সাধ্য কি তোমার হুরের গায়ে হাত দেয়।
সত্যি তুমি কত শক্তিশালী! হুর, তোমার দিকে চাইলে আমি গোটা দুনিয়াটাকে ভুলে যাই। তোমার মত পুরুষ বুঝি দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই।
নূরী, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস, তাই তুমি এ কথা বলতে পারলে।
হুর! অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে নূরী, তারপর আবেগভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—আজ তুমি এ কথা স্বীকার করলে! আমার ভালবাসার আঁচ এতদিনে অনুভব করলে তুমি। হুর, আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।
নূরী! বনহুর নূরীর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়।
গভীর আবেগে নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে। এমনি করে সে যদি চিরদিন হুরের বুকে মাথা রেখে কাটিয়ে দিতে পারত! পৃথিবীর আর কোন সুখ সে চায় না–শুধু চায় এইটুকু।
মানুষ যা চায় তা সবসময় পায় না। তাই নূরীরও এই সুখ, এই অনাবিল আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।
হঠাৎ বনভূমি প্রকম্পিত করে বেজে ওঠে বিপদ সঙ্কেতধ্বনি।
বনহুর তাড়াতাড়ি নূরীকে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের অজ্ঞাতে তার দক্ষিণ হাতখানা বেল্টে ঝুলান রিভলভারের গায়ে গিয়ে ঠেকে। সচকিত হয়ে ওঠে বনহুর।
নূরী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে–নিশ্চয়ই আবার সেই ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছে।
তক্ষুণি রহমত হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে—সর্দার, পুলিশ?
বনহুর মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল–পুলিশ?

হ্যাঁ সর্দার। পুলিশ ফোর্স অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে আসছে।
রহমত?
সর্দার?
পুলিশ আমার আস্তানার সন্ধান কি করে পেল?
সর্দার, এ প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে!
কিন্তু এখন ওসব আর ভাববার সময় নেই, আমার অনুচরদেরকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বল। একটা পুলিশও যেন ফিরে না যায়। আর শোনো, আমার ভূগর্ভ সুড়ঙ্গমুখ খুলে রাখ, প্রয়োজন হলে.........
যাও।
রহমত দ্রুত বেরিয়ে যায়।
নূরী শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে—হুর, এখন উপায়?
নূরী, শিগ্গির তুমি ভুগর্ভ সুড়ঙ্গপথে নিচে নেমে যাও। আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব করো না।
হুর, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না।
নূরী যাও। বনহুর চিৎকার করে ওঠে!
ওদিকে গুড়ুম গুড়ুম করে রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দ হচ্ছে।
নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে—তুমিও চলো হুর, নইলে আমি যাব না।
নূরী!
বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে নূরীর হৃদয় কেঁপে ওঠে, দু'চোখে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। একবার বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় সে।
বনহুর উদ্যত রিভলভার হাতে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে।
শুরু হয় পুলিশ আর দস্যুদলে ভীষণ যুদ্ধ!
বনহুর নিজেও লড়াই করে চলল। হত্যার উল্লাসে তার চোখের তারা দুটি নেচে উঠল। মুহূর্তে মুহূর্তে গর্জে উঠতে লাগল বনহুরের রিভলভার।
অসংখ্য পুলিশ নিহত হল। অসংখ্য দস্যু নিহত হলো।
লালে লাল হয়ে উঠলো বনভূমি।
পূর্বাকাশ আলো করে সূর্যদেব উঁকি দিয়েছে। যুদ্ধ তখন থেমে এসেছে, পুলিশ ফোর্স দিনের আলোয় দেখল—কিছু সংখ্যক মৃতদেহ ছাড়া আর একটা প্রাণীও নেই সেখানে।
সমস্ত বন তন্নতন্ন করে খোঁজা হল।
আস্তানার ঘর-দোর ভেংগেচুরে আগুন ধরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হল। কিন্তু দস্যু বনহুরের সন্ধান মিলল না।
এবার পুলিশ ফোর্স ফিরে চলল।
এত প্রচেষ্টা সব তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন পুলিশবাহিনীকে। এমন কি তাঁরা বিপুল

পুলিশবাহিনীসহ দস্যু বনহুরের আস্তানা অবধি হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু যার জন্য তাদের এত পরিশ্রম তাকে পাকড়াও করতে পারলেন না।

মিঃ জাফরী সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। রাগে-দুঃখে অধর দংশন করছেন। দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান পেয়ে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেন না। এতবড় পরাজয় আর কোনদিন তাঁর হয়নি।

দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান মিঃ জাফরী তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীর নিকট পেয়েছিলেন। মিঃ জাফরীর সহকারী মিঃ মুঙ্গেরী এখানে আসার পর হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন, মিঃ মুঙ্গেরীর অন্তর্ধানে মিঃ জাফরী মনে মনে রাগান্বিত ছিলেন; কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন রেখে প্রতীক্ষা করছিলেন, হতে পারে তিনি কোন গোপন রহস্য উদঘাটনে অদৃশ্য হয়েছেন। মিঃ জাফরী যখন মিঃ চৌধুরী, ডক্টর জয়ন্ত সেন এবং ভগবৎ সিংয়ের হত্যারহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, এমন দিনে হঠাৎ এক গভীর রাতে মিঃ মুঙ্গেরী সশরীরে উপস্থিত হলেন।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ব্যাপার কি? হঠাৎ গা ঢাকা দেবার কারণ?

মিঃ মুঙ্গেরী একগাল হেসে বললেন–আপনি তো স্যার হত্যা হস্য নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু ওদিকে বনহুরকে পাকড়াওয়ের কি করলেন?

ওঃ তুমি বুঝি তাহলে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে মনোনিবেশ করেছ?

হ্যাঁ স্যার, শুধু মনোনিবেশ করিনি, একেবারে..... একটু থেমে গলার স্বর খাটো করে নিয়ে বলেছিলেন মিঃ মুঙ্গেরী–একেবারে দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান এনেছি।

মিঃ জাফরীর দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, আগ্রহভরা কণ্ঠে বললেন–সত্যি বলছ মুঙ্গেরী?

ইয়েস স্যার! আপনি তো জানেন, মুঙ্গেরী যে কাজে মনোনিবেশ করে সে কাজ যতক্ষণ না-সমাধা হয় ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

হ্যাঁ, তাহলে তো অত্যন্ত সুখবর এনেছ মুঙ্গেরী। দস্যু বনহুর গ্রেফতার হলে তোমার সুনাম দেশবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। সরকার বাহাদুর মোটা পুরস্কারও দিবেন।

মিঃ মুঙ্গেরী মিঃ জাফরীর কথায় কান না দিয়ে বলেছিলেন—স্যার, আর বিলম্ব নয়, আজই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে আমরা দস্যু বনহুরের আস্তানায় হানা দেব। কথা বলতে মুঙ্গেরীর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে ওঠে। বলিষ্ঠ বাহু দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হয়।

মিঃ জাফরী মুঙ্গেরীর মুখোভাব লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট হন। তিনি জানেন মুঙ্গেরী বৃথা কোন কথা বলে না। মুঙ্গেরীর ওপর তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ তাঁর গোপন আলাপ-আলোচনা হলো।

মুঙ্গেরীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে দস্যু বনহুরের আস্তানায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ঠিকভাবেই কাজ করে গিয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দস্যু বনহুরের বহু অনুচর নিহত হয়েছে। এত দস্যু নিহত করেও মিঃ জাফর এবং মুঙ্গেরীর মনে শান্তি নেই! যতক্ষণ দস্যু বনহুরকে তাঁরা গ্রেফতার করতে সক্ষম না হয়েছেন ততক্ষণ তাঁরা নিশ্চিত নন।

শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে চললেন পুলিশ অফিসারগণ ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী।

❑

পুলিশ বাহিনী যখন ফিরে চলেছে, তখন বনহুর তার ভূগর্ভস্থ দরবার কক্ষে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে। সামনে দণ্ডায়মান রহমত আর কয়েকজন অনুচর। কয়েকজন আহত অনুচরকে দরবারকক্ষে একটা কম্বলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে।

নূরী বনহুরের একপাশে দণ্ডায়মান, তার পাশেই তার সহচরীগণ, সকলেরই মুখমণ্ডলই গম্ভীর, বিষণ্ন।

আহত অনুচরগণ করুণ আর্তনাদ করছে। কয়েকজন সুস্থ দস্যু তাদের সেবাযত্ন করছে। কেউ বা ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

কক্ষে সবাই নীরব।

শুধু দস্যু বনহুরের বুটের আওয়াজ আর আহত দস্যুগণের করুণ আর্তনাদ ছাড়া কারও মুখে কোন কথা নেই।

হঠাৎ বলে ওঠে রহমত–সর্দার, পুলিশ কি করে আমাদের আস্তানার সন্ধান পেলো বুঝতে পারছিনে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বনহুর, ফিরে তাকিয়ে বলে–এ প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে রহমত।

সর্দার আমি শুনেছি পুলিশ ইন্সপেক্টার জাফরী নাকি অত্যন্ত ধূর্ত।

সে শুধু ধূর্ত নয়, শিয়ালের মত চতুর। এবার আমি বুঝতে পেরেছি কে তাঁকে আমার আস্তানার সন্ধান দিয়েছে।

নূরী এবার বলে—নিশ্চয়ই সেই ছায়ামূর্তি।

হ্যাঁ সর্দার, আমাদেরও তাই মনে হয়-কোন গুপ্তচর ছায়ামূর্তির বেশে আমাদের আস্তানার সন্ধান নিয়ে গেছে।

বনহুর নীরবে কিছু চিন্তা করছিল, এমন সময় একজন অনুচর যন্ত্রণার আর্তনাদ করে উঠলো-সর্দার.... সর্দার.....

বনহুর ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে গেলো আহত অনুচরটার পাশে। হাঁটু গেড়ে বসলো, ওর বুকে হাত বুলিয়ে বললো- তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

হ্যাঁ সর্দার, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। সর্দার, আমি আর সহ্য করতে পারছি না......

বনহুরের পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হলো, তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা অশ্রু। বনহুর নিজ হাতে ওর ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিতে লাগল।

বনহুরের অনুচরদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নিহত আর আহত হয়েছিল। বনহুরের আস্তানার ক্ষতি হওয়ায় যতটুকু ব্যথিত সে না হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছিল তার বিশ্বস্ত অনুচরগণের মৃত্যুতে।

বনহুর অত্যন্ত ভালবাসতো তার এই অনুচরগণকে। নিজের জীবনকে সে তুচ্ছ করে দিত, তবু তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারতো না।

কিন্তু বনহুর তার অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকা বরদাস্ত করতে পারত না। যার মধ্যে সে অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেত তাকে সে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করত।

আজ বনহুর আর নূরী তাদের ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষে নিজ হাতে অনুচরগণের সেবাযত্ন করে চলল।

❑

মনিরা কি যেন কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, এমন সময় মরিয়ম বেগম এসে বললেন-মনিরা, একবার আমার ঘরে এসো।

মামীমার কণ্ঠস্বরে মনিরা মুখ তুলে তাকায়, গম্ভীর থমথমে কণ্ঠস্বর মামীমার। হঠাৎ কি হয়েছে তাঁর! অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মনিরা তার মুখের দিকে, তারপর বলে—আসছি মামীমা।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যান।

মনিরা বেশ চিন্তিত হয়, এমনভাবে তো তার মামীমা কোনদিন কথা বলেন না। তাড়াহুড়া করে হাতের কাজ শেষ করে মামীমার ঘরে যায় মনিরা। মনিরা কক্ষে প্রবেশ করেই ধমকে দাঁড়াল। দেখতে পায়, মামীমা গম্ভীর বিষণ্ন মনে খাটের একপাশে বসে আছেন। চোখ দু'টো তাঁর অশ্রু ছলছল বলে মনে হলো মনিরার।

মামীমার মুখোভাব লক্ষ্য করে তার মনটাও কেমন যেন বিষণ্ন হলো। এগিয়ে গিয়ে বলল—কি বলছিলে মামীমা?

মরিয়ম বেগম কোন কথা না বলে একখানা চিঠি এগিয়ে দেন মনিরার দিকে–পড়ে দেখো।

মনিরা চিঠি হাতে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে। তার বড় চাচা আসগর আলী সাহেব লিখেছেন। হঠাৎ তাঁর চিঠি দেবার কারণ কি? এতদিন তো তার বড় চাচা আসগর আলী মনিরার কোন খোঁজ-খবর নেননি? মনিরা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পড়তে শুরু করে, আসগর আলী সাহেব লিখেছেন–

–মা মনিরা, অনেক দিন তোমার খোঁজ-খবর নিতে পারিনি, সেজন্য আমি দুঃখিত। অবশ্য আমি তোমার সংবাদ সব সময় রেখেছি। মামা মামীর নিকটে কুশলেই আছ জেনে কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আজ আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কারণ এখন তোমার মামুজান নেই, তোমার সমস্ত দায়িত্বভার যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি আজ পরপারে। মামীমা মেয়ে মানুষ, নিজেই এখন অভিভাবকহীন–অসহায়। তুমি আগের মত আর ছোট নেই, তাই তোমাকে নিয়ে আমি বেশ ভাবনায় আছি। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে—আমার নিজের মেয়েও যা, তুমিও তাই–তোমার ভাল-মন্দ সব আমাকেই দেখতে হবে, কাজেই আমি এখন তোমাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে চাই। আমার বিশ্বাস, এতে তুমি অমত করবে না। তোমার মামীমাও নিশ্চয়ই রাজী হবেন। ইতি–

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী–
বড় চাচা

চিঠিখানা পড়া শেষ করে মনিরা স্তব্ধ হয়ে গেল। এবার বুঝতে পারল, কেন তার মামীমার মুখোভাব এমন হয়েছে, কেন তিনি কোনো কথা বলতে পারছেন না। মনিরা পরপর দু'বার চিঠিখানা পড়লো, তারপর চিঠিখানা ভাঁজ করে হাতের মুঠায় চেপে ধরল।

মরিয়ম বেগম বলে উঠলেন–সত্যিই তুই আমাকে ছেড়ে যাবি মনি?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে মনিরা—তুমি এ কথা ভাবতে পারলে মামীমা? মনিরা মরিয়ম বেগমের পাশে গিয়ে বসল। তারপর ছোট্ট বালিকার মত মামীমার হাত নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বলল–মামীমা, তুমি বিশ্বাস করো, কোনদিন আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না।

মনিরা, তুই ছেড়ে যাবি না বলছিস কিন্তু জানিস না মা তোর বড় চাচা আসগর আলী সাহেবকে, তিনি যা বলবেনযা ভাববেন—তা করবেনই।

আমি তাঁকে চিনি না, জানি না, তিনি যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষীই হবেন। তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই এসে আমাকে দেখেশুনে যেতেন।

কি করবি মা, আমাদের চেয়ে তোর ওপর তাঁদের দাবী অনেক বেশি। তিনি যদি তোকে জোর করে নিয়ে যান তবে আমরা তোকে ধরে রাখতে পারব?

কেন পারবে না মামীমা, কেন পারবে না। আমি কি তোমাদের মেয়ে নই?

মাতৃকূলের কাছে পিতৃকূলের দাবী অনেক বেশি। তোর উপর আমার যে কোন দাবী নেই মা। মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ চাপা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

মনিরার মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে ওঠে। তীব্রকণ্ঠে বলে মনিরা–আমি তাদের দাবী স্বীকার করি না। যারা এতদিন ভুলেও আমার ছায়া মাড়ায়নি, আজ তারা এসেছে পিতৃকূলের দাবী নিয়ে। না না, কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না–যেতে পারি না।

মনিরা, পিতৃকুলের দাবীকে অস্বীকার করলেও একদিন আসগর আলী সাহেব সশরীরে চৌধুরী বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে এসেছে তাঁর দু'জন আরদালী আর একজন আত্মীয় ভদ্রলোক। আসগর আলী সাহেব বজরায় এসেছেন–উদ্দেশ্য মনিরাকে তিনি নিয়ে যাবেন। কিন্তু মনিরা আসগর আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই এলো না। নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে রইল।

মরিয়ম বেগম কিন্তু মনের দুঃখ প্রকাশ না করে নিজের সাধ্যমত আদর যত্ন করতে লাগলেন। মরিয়ম বেগমের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলেন আসগর আলী সাহেব। কিন্তু তিনি এতক্ষণও মনিরাকে না দেখতে পেয়ে চঞ্চল হলেন। মরিয়ম বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন–ভাবী, মনি কোথায়? ওকে তো দেখছি না?

মরিয়ম বেগম বললেন–শরীরটা খারাপ, তাই শুয়ে আছে।

গম্ভীর হয়ে পড়লেন আসগর আলী সাহেব, বললেন–শরীর খারাপ আজই হলো, না আগে থেকেই ছিল?

আমতা আমতা করে বললেন মরিয়ম বেগম–হঠাৎ আজ ক'দিন ওর শরীরটা...

খারাপ যাচ্ছে, এই তো? মনে হয় আমার চিঠি পাবার পর থেকে। কিন্তু মনে রাখবেন ভাবী, ওকে আমি নিয়ে যাবই। আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে, আপনার চেয়ে ওর ওপর আমার দায়িত্ব অনেক বেশি।

তা জানি। কিন্তু....

কিন্তু নয়, এখন মনিরা আগের মত কচি খুকী নেই। বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে।

তা ঠিক।

আপনিই বলুন তাকে এখন এভাবে যেখানে সেখানে ফেলে রাখা যায়?

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন মরিয়ম বেগম—যেখানে সেখানে....এ আপনি কি বলছেন?

যা বলছি সত্য কথা। এতদিন মনিরা নাবালিকা বলে তাকে আপন বানিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, এমন কি তার বাবার বিশাল ঐশ্বর্য ভোগ করে আসছেন–

এসব আপনি বলছেন আলী সাহেব, মনিরার ঐশ্বর্য আমরা ভোগ করে আসছেন।

এসব আপনি কি বলছেন আলী সাহেব—

মনিরা ঐশ্বর্য আমার ভোগ করে আসছি?

তা নয় তো কি? মনিরার বিশাল ধন-সম্পদ এখন কাদের হাতের মুঠায়? চৌধুরী সাহেব নিজেই আত্মসাৎ করে নেননি?

না। তিনি পরের ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল ছিলেন না।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন আসগর আলী সাহেব—একথা আর কেউ বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না। মনিরাকে এবং তার মাকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে কি ঐ একটিমাত্র কারণ নেই—আমার ছোট ভাইয়ের ধন-সম্পদ? চৌধুরী সাহেব সরলতার ভান করে মনিরা আর তার মায়ের সব লুটে নেননি আপনি বলতে চান?

মরিয়ম বেগম স্তব্ধ হয়ে যান, কোন কথাই তিনি আর বলতে পারছেন না। কে যেন তাঁর কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

আসগর আলী সাহেব বলেই চলেছেন–মনিরার বাবা বেঁচে থাকলে পারতেন এসব করতে?

ঠিক সেই মুহূর্তে দমকা হাওয়ার মত কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা—বড় চাচা বলে আমি আপনাকে ক্ষমা করবো না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না আপনার এসব বলতে?

মনিরাকে হঠাৎ এভাবে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমে আশ্চর্য, পরে রাগান্বিত হন আসগর আলী সাহেব। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মনিরা বলে চলে–আমার মামুজান আপনার মত লোভী ছিলেন না। আমার ঐশ্বর্যের চেয়ে তাঁর হৃদয় অনেক বড় ছিল। সেখানে ধন-সম্পদের মত তুচ্ছ জিনিসের কোন দাম ছিল না। আমি জানি, মামুজান আমার ঐশ্বর্যের এতটুকু নষ্ট করেননি। বরং এতদিন আপনার নিকটে থাকলে....

বিনষ্ট হত, তাই বলতে চাও?

হ্যাঁ, আমাকেও হয়তো পথে দাঁড়াতে হত।

মনিরা!

বড় চাচা, আমি জানতাম না আপনার মন এত নীচু, এত ছোট।

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন—মনিরা, সাবধানে কথা বল, উনি তোমার গুরুজন।

উনি নিজের সম্মান বাঁচিয়ে চলতে না পারলে আমি কি করতে পারি? উনি যে আমার বড় চাচা, ভাবতেও ঘৃণা বোধ করছি। আমার শরীরে ওদের রক্ত প্রবাহিত, একথাই আমি ভাবতে পারি না। অনেক দিন আমি উনাকে দেখিনি, উনাকে আমার তেমন করে মনেও পড়ে না। এতদিন একটিবার খোঁজ-খবর নিয়েও জানেননি যে, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি–আজ এসেছেন বড় চাচার দাবী নিয়ে! এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল মনিরা।

আসগর আলী সাহেবের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন–সমস্ত শেখানো কথা। ভাবী, এসব মনিরাকে আপনি....

এই তো একটু আগেই আপনি মামীমার কাছে বললেন মনিরা এখন আগের মত কচি খুকী নেই। সত্যিই আমি আগের মত সেই ক্ষুদ্র বালিকা নই, নিজের ভালমন্দ বুঝবার মত জ্ঞান আমার আছে। আপনি আমার গুরুজন হতে পারেন কিন্তু অভিভাবক নন।

মনিরা, তুমি যতই আমাকে অস্বীকার কর কিন্তু আমি তোমার বাবার বড় ভাই।

তা জানি।

আমি এসেছি তোমাকে নেবার জন্য।

কেন?

বয়স তোমার কম হয়নি। তুমি আমাদের বংশের মেয়ে। তোমার কলঙ্ক আমাদের মুখে চুনকালি মাখাবে।

আমি তেমন কিছু করিনি যা আপনাদের মুখে চুনকালি দিতে পারে।

করনি? তোমার মামার ছেলে দস্যু বনহুরকে তুমি স্বামী বলে গ্রহণ করতে চাওনি?

চেয়েছি। এতে আপনাদের মুখে চুন কালি পড়ার কথা নয়।

না, একটা দস্যুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

আমার বিয়ে যেখানে খুশি হউক বা না হউক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না।

মানে?

মানে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই না।

তুমি ঐ দস্যু-চোর-ডাকু লম্পটকে....

হ্যাঁ, আমি তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ করব। একটি কথা আপনি ভুল বুঝছেন—সে দস্যু বটে—কিন্তু চোর বা লম্পট নয়।

আবার হেসে ওঠেন আসগর আলী সাহেব, ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি, তারপর বললেন–যার কুৎসা সারা দেশময়, লোকের মুখে মুখে যার বদনাম–

বদনাম নয় বড় চাচা–সুনাম! দস্যু বনহুরের জন্য আজ দেশবাসী পরাধীনতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশের জন্য সে যতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে, কেউ ততখানি পেরেছে?

ওসব জানতে চাই না মনিরা। আমি বলছি, কিছুতেই একটা দস্যুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। তুমি নিজে যেতে না চাইলে আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

❑

শেষ পর্যন্ত মরিয়ম বেগম মনিরাকে ধরে রাখতে পারলেন না, মনিরার কোন আপত্তি চলল না, আসগর আলী সাহেব জোরপূর্বক নিয়ে গেলেন মনিরাকে।

সরকার সাহেব বাধা দিতে এসেছিলেন, তাঁকে অপমানিত করে সরিয়ে দেয়া হল।

নকীব পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল, তাকে লাঠির আঘাতে আহত করা হলো। চৌধুরী বাড়িতে একটা শোকের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

মরিয়ম বেগম কেঁদে কেটে আকুল হলেন। আজ চৌধুরী সাহেব বেঁচে থাকলে আসগর আলী সাহেব এভাবে মনিরাকে নিয়ে যেতে পারতেন? কখনও না, এমন কি মনিরাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পর্যন্ত তুলতে পারতেন না।

মরিয়ম বেগম চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললেন। এই বিরাট বাড়িখানায় আজ তিনি একা। কেউ নেই তাঁকে এতটুকু সান্ত্বনা দেবার।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব তবু যতটুকু পারেন বুঝাতে চেষ্টা করেন, বাড়ির দাস-দাসী সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু যতই তাঁকে সবাই বুঝাতে চায় ততই তিনি কেঁদে আকুল হন। মনিরাই যে ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি আজও বেঁচে আছেন।

সেই মনিরা আজ নেই।

যেদিকে তাকান মরিয়ম বেগম সেদিকেই অন্ধকার দেখেন। ভাবেন মনিরা যদি তার নিজের সন্তান হতো তাহলে কি পারত কেউ তাকে এভাবে জোর করে নিয়ে যেতে? কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেক বেশি দাবী রয়েছে ওদের। আসগর আলী যে তাঁর পিতার বড় ভাই...নানা কথা ভেবে সান্ত্বনা খোঁজেন মরিয়ম বেগম নিজের মনে।

❑

বজরার এক কোণে নিশ্চুপ বসেছিল মনিরা। দৃষ্টি তার নদীর পানিতে সীমাবদ্ধ। কত কি আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে সে, এতকাল মামা-মামীমার নিকট কাটিয়ে আজ সে কোথায় চলেছে। যেখানে নেই এতটুকু স্নেহ-মায়া মমতা দেখানোর কেউ—নেই কেউ তার পরিচিত। যদিও আসগর আলী সাহেব তার বড় চাচা হন তবু তাদের কাউকে মনিরা তেমন করে জানে না। অনেক ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে চলে এসেছে মনিরা শহরে। তারপর অবশ্য দু'বার গিয়েছিল দেশের বাড়িতে কিন্তু সামান্য দু'একদিনের জন্য।

আদতে বড় চাচা আর বড় চাচীর ব্যবহার তাকে সন্তুষ্ট করেনি। তাদের পুত্রকন্যাগুলোও কেমন যেন ঈর্ষার চোখে দেখত তাকে। মনিরা ওদের সঙ্গে কোনদিন মন খুলে কথা বলতে পারেনি। মিশতে গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে এসেছে।

তারপর তো বহুদিন আর দেশের বাড়িতেই যায়নি মনিরা। মা বেঁচে থাকতে তিনি মাঝে মাঝে গিয়ে বিষয় আশয় দেখাশুনা করে আসতেন। মায়ের মৃত্যুর পর মামুজানই বছরে একবার যেতেন, মনিরার বিষয় আশয় যাতে নষ্ট হয়ে না যায়। মামুজানের মৃত্যুর পর এখন মামীমা আর সরকার সাহেব মনিরার সব দেখাশোনা করছিলেন। নিশ্চিন্তই ছিল মনিরা, হঠাৎ কোথা থেকে বড় চাচার আবির্ভাব হল, কি মতলবে যে তিনি ওকে নিয়ে চলেছেন—তিনিই জানেন।

মনিরাকে ভাবাপন্ন বসে থাকতে দেখে বললেন আসগর আলী সাহেব—মনি কি ভাবছ?

মনিরা কোনো কথা বললো না।

আসগর আলী সাহেব তাঁর বিশাল বাপু নিয়ে মনিরার পাশে এসে বসলেন, তারপর গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বললেন—মনিরা, আমি তোমার ভালোর জন্যই নিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুমি আমার ছোট ভাইয়ের একমাত্র সন্তান-বংশধর, কাজেই আমার কর্তব্য তোমার মঙ্গল সাধন করা। দেখ মনিরা, তোমার মামীমা তোমাকে যতই ভালবাসুক কিন্তু তার সঙ্গে তোমার রক্তের কোন সংশ্রব নেই। মুখে যতই দরদ দেখাক তার পেছনে রয়েছে স্বার্থ। তোমার বিশাল ঐশ্বর্যের মোহ তাকে----

মনিরা চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিল-চুপ করুন বড় চাচা, আমি ওসব শুনতে চাই না।

তা চাইবে কেন। কিন্তু মনে রেখ, আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত যা তা করতে দেব না।

মনিরা একবার ফিরে তাকাল আসগর আলী সাহেবের মুখের দিকে, কোন কথা বলল না।

আসগর আলী সাহেব বলে চললেন—আজ তুমি আমার ওপর রাগ করে মন খারাপ করছ, কিন্তু যখন দেখবে আমি তোমার ভালোই করছি, তখন তোমার এ ভুল ভেঙে যাবে।

মনিরাকে নিয়ে আসগর আলী সাহেবের বজরা যখন ঘাটে ভিড়ল তখন বাড়ির যত মহিলা এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। চাচীমা সবার আগে এলেন—কই, মা মনিরা কই!

বজরার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন আসগর আলী সাহেব—ভেব না, তাকে এনেছি। তারপর বজরার মধ্যে প্রবেশ করে বললেন—মনি, উঠে এসো, বাড়িতে পৌঁছে গেছি।

মনিরা পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল।

অগত্যা চাচীমা বজরায় উঠে এলেন—মা মনিরা। মনিরা কোথায় তুমি? ভিতরে প্রবেশ করে বলে ওঠেন-এই যে এখানে চুপটি করে বসে আছ। ওঠো মা—ওঠো, দেখ কোথায় এসেছ!

মনিরা পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল, অনুসরণ করল চাচীমাকে।

চাচীমা বললেন—খুব সাবধানে নেমো, দেখো পা পিছলে পড়ে যেও না যেন। দাও, হাতটা আমার হাতে দাও।

মনিরা চাচীমার হাতে হাত না রেখেই নেমে পড়ল বজরা থেকে! কিন্তু একি, অন্দরবাড়িতে প্রবেশ করতেই মনিরার মনটা চড়াৎ করে উঠল।

ব্যাপার কি, উঠানে শামীয়ানা টাঙানো। ঘর-দোর কাগজের ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। একপাশে একটা মঞ্চের মত উঁচু জায়গা লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। চারপাশে নানারকম ফুলঝাড়।

মনিরা আশ্চর্য হয়ে দেখতে দেখতে এগুচ্ছে। চাচীমা আগে আগে চলেছেন, আর পেছনে অগণিত ছেলেমেয়ে আর যুবতী ও বৃদ্ধা। সবাই যেন অবাক হয়ে মনিরাকে দেখছে।

একটা বড় ঘরের মধ্যে মনিরাকে নিয়ে বসানো হল।

চাচীমা মেয়েদের লক্ষ্য করে বললেন—তোমরা সব ওদিকে সেরে নাও, আমি মনিরাকে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে গোসল করিয়ে নি।

মেয়েরা সবাই মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

চাচীমা দরদভরা গলায় বললেন—আহা, মার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। সেই সাত সকালে বজরায় চেপেছে। চলো মা, চলো, গোসল করে চারটা খাবে চল।

আমার ক্ষিদে নেই, গোসল করতে হবে না। গম্ভীর কণ্ঠে বলল মনিরা।

অবাক কণ্ঠে বললেন চাচীমা—সে কি বাছা, গোসল করবে না, ক্ষিদেও নেই—এ তুমি কি বলছ?

মনিরা কোনো কথা বলল না।

চাচীমা আবার বললেন—চলো মা, লক্ষ্মীটি, চলো। বিয়ের সময় হয়ে এলো বলে.....

চমকে ওঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে মনিরা—বিয়ে! কার বিয়ে?

সেকি মা, তোমার বড় চাচা তোমাকে কিছু বলেননি? ও, তুমি লজ্জা পাবে তাই বুঝি উনি বলেননি। শোনো মা—শহীদের সঙ্গে তোমার বিয়ে।

শহীদ! কে শহীদ?

ওমা, সেকি, শহীদকে চেন না? আমাদের ছেলে শহীদ। ঐ যে তোমার সঙ্গে খেলা করত। অবশ্য তোমার চেয়ে বছর সাত-আট বড় হবে আমার শহীদ। কিন্তু শরীরটা যা ওর রোগাটে, তাই এতটুকু হয়ে আছে। দেখলে মনে হয় এখনও বিশ বছর হয়নি। দাড়িগোঁফের নামগন্ধ নেই—বাছার আমার মেয়েদের মত সুন্দর ফুটফুটে মুখ। ঐ তো ওকে মেয়েরা সব গোসল করাচ্ছে-

এমন সময় শোনা যায় একটা মহিলার কণ্ঠস্বর-বড় আম্মা, এসো, শহীদ ভাই কথা শুনছে না, শুধু শুধু পানি মাথায় ঢালছে। শিগগির এসো-

চাচীমা হেসে বললেন—দেখ, এখনও তার ছেলেমি যায়নি। যাই দেখি। বেরিয়ে যান চাচীমা।

মনিরা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে। একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় ডাকে—এই শোনো।

বাচ্চা ছেলেটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর এগিয়ে আসে— কি বলছ?

তোমার নাম কি?

ছেলেটা জবাব দেয়— আমার নাম মামুন।

খুব সুন্দর নাম তো তোমার। এই শোনো, এ বাড়িতে কার বিয়ে জান?

বা রে জানি না? আমার মেজো ভাইয়ার বিয়ে?

মেজো ভাইয়া?

হ্যাঁ, শহীদ ভাইয়ার বিয়ে তোমার সাথে, তুমি যে আমাদের ভাবী হবে—

মামুনের কথায় রাগ হয় মনিরার, ঠাস করে কটা চড় বসিয়ে দেয় সে তার গালে।

আচমকা চড় খেয়ে মামুন ভ্যা করে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে চাচীমা, আরও কয়েকজন মহিলা কি হল কি হল করে।

চাচীমা বললেন কি হয়েছে রে মামুন?

আংগুল দিয়ে মনিরাকে দেখিয়ে বলে— ভাবী মেরেছে।

অমনি মনিরা কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে— খবরদার, আবার যদি ভাবী বলবি।

গালে হাত রাখেন চাচীমা ওমা সেকি গো! এই তো একটু পরে কলেমা পড়ে শহীদের বৌ হবে। ভাবী নয় তো কি?

চাচীমা, এসব কি বলছেন আপনারা? বিয়ে আমি এখন করব না।

অবাক কণ্ঠে বললেন চাচীমা— করব না বললেই হলো। তোমার বড় চাচা তোমাকে তাহলে এমনি এমনি নিয়ে এলেন?

তা তিনি যা মনে করেই আনুন না কেন, বিয়ে আমি করব না।

করতে হবে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন বড় চাচা। দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। কঠিন কণ্ঠে বলেন— তোমার কোন আপত্তি শুনব না মনিরা।

মনিরা তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়— আপনি যতই বলুন, বিয়ে আমি করব না। মামুজানকে আপনি লোভী স্বার্থপর বলে অপবাদ দিচ্ছিলেন, এখন বুঝতে পারছি কেন আপনি আমাকে জোর করে নিয়ে এলেন—আমাকে হাতের মুঠায় এনে আমার সমস্ত বিষয় আশয় আত্মসাৎ করতে চান। আপনার পাগল ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে জীবন্ত হত্যা

করতে চান। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার এ কুমতলব সিদ্ধ হবার নয়। প্রাণ গেলেও আমি শহীদকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না।

তা আয়োজন আমার পণ্ড করে দিতে চাও? মনে রেখ মনিরা, দুনিয়া পাল্টে যেতে পারে তবু তোমাকে আমি পুত্রবধু করবোই। আমার ছোট ভাইয়ের ধন-সম্পদ আমি কারও হাতে তুলে দিতে পারি না—বেরিয়ে যান আসগর আলী সাহেব।

গোটা দিন কেটে গেল মনিরা দানাপানি মুখে দিল না। সন্ধ্যার পর বিয়ে হবে, কিন্তু মনিরা বেঁকে বসলো, বলল—দুটো দিন সময় দিন বড় চাচা, তারপর আপনি যা বলবেন শুনব।

অগত্যা আসগর আলী সাহেব মনিরার কথায় রাজী হলেন, সেদিনের মত বিয়ে স্থগিত রইল।

❑

বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় গা ঢাকা দিয়ে রইল বটে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাজকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। পুরোদমে চলল তার দস্যুবৃত্তি।

এর টাকা-পয়সা ওর, অলঙ্কার আর ধনরত্ন লুটে নিয়ে স্তূপাকার করতে লাগল সে তার পাতালপুরীর রত্নাগারে। দস্যু বনহুর যেন প্রলয় কাণ্ড শুরু করেছে।

পুলিশমহলে আবার সাড়া পড়ল।

দেশবাসীর মনে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। কেউ নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে পারছে না। সবাই দস্যু বনহুরের ভয়ে আড়ষ্ট।

মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস করে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা দেখলেন দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস এবং তার কিছু সংখ্যক অনুচরকে নিহত করে কোনই লাভ হয়নি বরং দস্যু বনহুরকে ক্ষেপানো হয়েছে তখন একটু ঘাবড়ে গেলেন।

মিঃ মুঙ্গেরী অনেক কষ্টে এই আস্তানার সন্ধান লাভ করেছিলেন। এই আস্তানার সন্ধান করতে গিয়ে কতদিন তাঁর না খেয়ে কেটেছে। কতদিন তাঁকে অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। গহন বনে লুকিয়ে লুকিয়ে চলাফেরা করতে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছে, এমনকি প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে তবেই মিঃ মুঙ্গেরী দস্যু বনহুরের আস্তানার খোঁজ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস হলেও তার যে কোন ক্ষতি হয়নি বেশ বুঝা যায়।

একদিকে দস্যু বনহুর, অন্যদিকে ছায়ামূর্তি।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্যের সঙ্গে আরও দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, কোনোটারই সমাধান আজও হলো না। মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

সেদিনের বৈঠকে মিঃ হারুন বললেন—আপনারা যতই বললুন—ছায়ামূর্তি যে খান বাহাদুর সাহেবের পলাতক ছেলে মুরাদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন বললেন— একথা নির্ঘাত সত্য। সেই মুরাদই এই তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন— আপনাদের অনুমান সত্যও হতে পারে। পুলিশ রিপোর্টে মুরাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমারও ঐ রকম সন্দেহ হয়।

শঙ্কর রাও বললেন— স্যার, চৌধুরী সাহেবকে হত্যা করার পেছনে মুরাদের যে হাত ছিল এটা সত্য কিন্তু শয়তান নাথুরাম আর ডক্টর জয়ন্ত সেনকে কেন সে হত্যা করবে? আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি, তাছাড়া আমিও জানি নাথুরাম ছিল মুরাদের দক্ষিণ হাত।

কাজেই তাকে মুরাদ হত্যা করতে পারে না—তাই না মিঃ রাও? কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ আলম।

মিঃ রাও বললেন গভীরভাবে চিন্তা করলে তাই মনে হয়।

মিঃ হারুন বললেন— হঠাৎ কর্পূরের মত কোথায় উবে গিয়েছিলেন মিঃ আলম?

মিঃ আলম আসন গ্রহণ করে বললেন— ছায়ামূর্তির সন্ধানে।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— নিশ্চয়ই কোন নতুন খবর আছে মিঃ আলম?

একেবারে নেই বললে মিথ্যে বলা হবে। কেঁচো খুঁড়তে সাপের সন্ধান পেয়েছি।

কক্ষস্থ সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে আলম সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন। মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে।

মিঃ আলম বললেন—আমি মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। ইচ্ছা ছিল তার কাছে চৌধুরী হত্যার সন্ধান পাই কিনা। অবশ্য তাকে আমি কোনোরূপ সন্দেহ করিনি। কিন্তু তার সঙ্গে গভীরভাবে আলাপ করে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে নিশ্চয়ই মনিরা তার মামুজানের হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে।

মিঃ জাফরী বললেন— মনিরা তার মামুজানের হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, আপনার এরকম সন্দেহের কারণ?

সেই তো বললাম কেঁচো খুঁড়তে সাপের সন্ধান পেয়েছি-সব কথা আপনাকে বলব স্যার, তবে এখানে নয়—একেবারে নির্জনে।

মিঃ আলমের কথা শেষ হতে না হতে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সহকারী গোপাল বাবু। মুখোভাবে বেশ চাঞ্চল্য ফুঠে উঠেছে। কক্ষস্থ সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন— আমি ছায়ামূর্তির সন্ধান পেয়েছি।

সকলেই একসঙ্গে তাকালেন গোপালবাবুর মুখের দিকে।

গোপালবাবু বললেন—স্যার, কাল গভীর রাতে আমি যখন শঙ্করবাবুর নিকট থেকে বাসায় ফিরছিলাম তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে মানে আমার হাত কয়েক দূরে ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল।

মিঃ হারুন বললেন—ছায়ামূর্তি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, বলেন কি গোপালবাবু। ইচ্ছা করলে আপনি তাকে পাকড়াও করতে পারতেন।

এত যদি সহজ হয়ত মিঃ হারুন তাহলে— বলতে বলতে থেমে গেলেন মিঃ আলম তারপর একবার মিঃ জাফরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন —স্যার, তাহলে বিফল হতেন না।

মিঃ আলমের কথায় মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ রক্তাভ হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখোভাব পরিবর্তন করে নিয়ে বললেন—ছায়ামূর্তি অত্যন্ত চতুর বুদ্ধিমান ...

না হলে কি এতগুলো পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সম্মুখে ঘুরে বেড়ায়। আমিও কি কম নাজেহাল হয়েছি এই ছায়ামূর্তির সন্ধানে। কথাগুলো বললেন মিঃ আলম।

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন— গোপাল, তুমি যখন আমার বাসা থেকে বিদায় নিয়ে গেলে তখন রাত কত ছিল?

গোপাল বাবু মাথা চুলকে বললেন— রাত তখন চারটে।

মিঃ জাফরী বললেন—এত রাতে বন্ধুর কাছ হতে কেন বিদায় হলেন? আর দু'ঘণ্টা কাটানোর মত কি জায়গা ছিল না?

গোপাল বাবু তাকালেন শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে। তারপর বললেন—শংকর আমাকে বাসায় যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল।

মিঃ জাফরী গম্ভীর মুখে তাকালেন মিঃ শঙ্কর রাওয়ের মুখে। তারপর বললেন—তাকে কেন আপনি চলে যেতে বললেন।

স্যার, আমার সে কথা গোপনীয়, আমি বলতে পারব না। শঙ্কর রাও সচ্ছভাবে বললেন।

এবার মিঃ জাফরী বললেন—গোপাল বাবু ছায়ামূর্তিকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন মনে আছে?

হ্যাঁ মনে আছে। আমার গাড়ি নিয়েই আমি যাচ্ছিলাম। বেশি রাত হবে বলে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম শঙ্করের ওখানে। একথা সেকথার মধ্যে কখন যে রাত চারটে বেজে গিয়েছিল আমরা কেউ টের পাইনি। দেয়ালঘড়ির ঢং ঢং শব্দে হুঁশ হয়েছিল। শঙ্কর বলল—যা শিগগির বাড়ি যা। আমি বললাম—থেকে গেলে হয় না? কথার ফাঁকে আর একবার মিঃ শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে তাকান গোপাল বাবু, তারপর বলেন, আমারও ভাল লাগল না তাই বাড়ি চলে গেলাম। আমার বাড়ি যেতে হলে চৌধুরীবাড়ির পেছন পথ বেয়ে যেতে হয়; সেই পথে আমি ছায়ামূর্তিকে দেখেছি— চৌধুরীবাড়ির কবরস্থানের দিকে তাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

মিঃ জাফরী একটা শব্দ করলেন— হুঁ।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সবাই উঠে পড়লেন।

❑

মনিরার শূন্যকক্ষে প্রবেশ করে দাঁড়াল দস্যু বনহুর। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। আজ বেশ কিছুদিন এখানে আসতে পারেনি সে, নানা ঝঞ্ঝাটে

ছিল। আজ হঠাৎ তার মনটা কেন যেন অস্থির হয়ে পড়েছিল। দস্যুতা করতে গিয়ে সেই বেশেই এসে হাজির হলো মনিরার কক্ষে। কিন্তু একি! মনিরা কোথায়? মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল তার।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, অমনি তাকে দেখে ফেলল নকিব, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো চোর চোর চোর----

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ছুটে এলো বাড়ির চাকর বাকর আর বৃদ্ধ সরকার সাহেব। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে সুড়কি, কারও হাতে চাকু, কিন্তু ততক্ষণে বনহুর উধাও হয়েছে।

সকলের সঙ্গে মরিয়ম বেগমও এসে উপস্থিত হলেন সেখানে, সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন—কোথায় চোর?

সরকার সাহেবের হয়ে ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলে ওঠে নকিব আম্মা, হেঁইয়া কালো ভূতের মত চেহারা কোথায় যেন হাওয়ায় মিশে গেল ঐ যে আপামনির ঘরের বারান্দায়—দেখেছি—

সরকার সাহেব এবং অন্যান্যে মিলে গোটা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথায়ও কাউকে দেখতে পেলেন না।

এবার সবাই যার যার ঘরে ফিরে গেল।

মরিয়ম বেগম নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন, যেমনি তিনি বিছানার দিকে এগুতে যাবেন, অমনি আলমারীর পেছন থেকে বেরিয়ে এলো দস্যু বনহুর।

মরিয়ম বেগম চিৎকার করতে যাবেন, অমনি বনহুর মুখের কালো আবরণ সরিয়ে ফেলল।

মরিয়ম বেগম অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন— মনির।

হ্যাঁ মা, আমিই সেই চোর যাকে এতক্ষণ তোমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান হচ্ছিলে। মনিরা কই মা?

মনিরা? তাকে তো তার বড় চাচা দেশের বাড়িতে নিয়ে গেছে।

কেন?

মনিরা তাদের বংশের মেয়ে, কাজেই মনিরার ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই। এতদিন ওকে নাকি আমরা ওর ঐশ্বর্যের লোভে মানুষ করেছি। তোর আব্বা নাকি মনিরার সব ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। আরও কত কি যে বলে গেল তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না বাবা—সে অনেক কথা।

বনহুরের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে ওঠে। অধর দংশন করে বলে— সে বলে গেল আর তুমি নীরবে শুনে গেলে?

তাছাড়া তো কোন উপায় ছিল না বাবা!

বনহুর কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল—এতদিন যে বড় চাচার কোন খোঁজ-খবর ছিল না, আজ সে হঠাৎ গভীর দরদ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি?

মনিরাকে নিয়ে যাবার সময় তারা জোর করে নিয়ে গেছে। মা কি আমার যেতে চায়?

সব বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যাবার কোন উদ্দেশ্য আছে। মা আজই আমি চললাম।

কোথায়?

মনিরাকে আনতে।

সেখানে তুই যাবি বাবা? শুনেছি আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে বন্দুকধারী পাহারাদার পাহারা দেয়।

মায়ের কথায় হাসল বনহুর, তারপর বলল—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, আমি মনিরাকে তোমার নিকটে এনে দেব। কথা শেষ করে পেছন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর। মরিয়ম বেগম নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত থ'মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বাগানবাড়ির পেছনে ভেসে ওঠে অশ্বপদ শব্দ খট্ খট্ খট্...

☐

তাজের পিঠে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে বনহুর।

কোনদিকে তার খেয়াল নেই। গভীর রাতের অন্ধকারে, বনহুরের জমকালো পোশাক মিশে একাকার হয়ে গেছে।

বনহুর যখন তাজের পিঠে ব- প্রান্তর মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলেছে -তখন আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে মহা ধুমধাম শুরু হয়েছে। আজ ভোর রাতে মনিরার বিয়ে আসগর আলী সাহেবের ছেলে শহীদের সঙ্গে।

অনেকগুলো মেয়ে মনিরাকে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত।

আসগর আলী সাহেব নানারকমের মূল্যবান অলঙ্কার গড়ে দিয়েছেন মনিরার জন্য। মূল্যবান শাড়ি ব্লাউজ আরও অন্যান্য সামগ্রী। উদ্দেশ্য মনিরাকে খুশি করা।

ওদিকে শহীদকে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত যুবকের দল।

শহীদ বার বার হাই তুলছে আর বলছে—কখন বিয়ে হবে? আমার কিন্তু বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মা পাশেই ছিলেন আদরভরা গলায় বলেন এই তো শুভলগ্ন হল বলে। বিয়ে থা, সময়ক্ষণ দেখে তবে হতে হয়। কথাগুলো বলে কনের ঘরে এলেন তিনি— কি গো, তোমাদের হয়েছে তো?

এমন সময় আসগর আলী সাহেব এলেন সেখানে—এখনও তোমাদের হয়নি? বিয়ের সময় তো হয়ে এলো— ভোর পাঁচটায় বিয়ে; এখন রাত চারটা। সব ঠিক করে নাও, মুন্সী সাহেব বাইরে বিয়ে পড়িয়ে অন্দরবাড়িতে আসবেন।

হলঘরের সম্মুখে বিরাট শামিয়ানার তলায় হাজার হাজার লোক বসে গেছে, বরকে নিয়ে বসানো হলো তাদের মাঝখানে।

বাইরে বরকে প্রথমে বিয়ের কলেমা পড়ানো হবে। মুন্সী সাহেব তার কেতাব খুলে বসলেন।

মেয়েরা সবাই মনিরাকে ছেড়ে বিয়ে দেখতে ছুটল, কেউ দরজার ফাঁকে, কেউ প্রাচীরের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

মনিরা একা বসে আছে। বিয়ের সাজে তাকে সাজানো হয়েছে। সমস্ত শরীরে মূল্যবান শাড়ি আর গয়না। ললাটে চন্দনের টিপ। মনিরা ভাবছে— কিছুতেই এ বিয়ে হতে পারে না— যেমন করে হউক, তাকে বিয়ে বন্ধ করতে হবে। এ বাড়িতে আসার পরদিনই বিয়ের আয়োজন করেছিল ওরা। মনিরা নানা কৌশলে বন্ধ করেছিল কিন্তু আজ আর তার কোনো আপত্তি টিকছে না। এখন কি উপায়? কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না, জীবন গেলেও না ---- বিষ খাবে সে—

হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, একটা শব্দে ফিরে তাকায় সে। মুহূর্তে মনিরার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে সে— মনির, তুমি এসেছ!

বনহুর ঠোটের ওপর আংগুলচাপা দিয়ে মনিরাকে চুপ হতে বলে।

মনিরা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে, তারপর ব্যস্তকণ্ঠে বলে—শিগগির নিয়ে চল। আমাকে বাঁচাও মনির।

বনহুর এখানে পৌঁছেই বাড়ির আয়োজন দেখে অনুমানে সব বুঝে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মনিরার বিয়ে দিয়ে তাকে হাতের মুঠোয় ভরতে চলেছেন আসগর আলী সাহেব।

বনহুর অদূরে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে তাজকে রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এই কক্ষে প্রবেশ করেছে। এই পথটুকু যে কেমন করে সে এসেছে সেই জানে।

প্রায় আধঘন্টা বনহুর সুযোগের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। যেমনি মেয়েরা ওদিকে বিয়ে পড়ানো দেখতে গেছে, অমনি সে আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

আর বিলম্ব না করে বনহুর মনিরাকে নিয়ে পেছন জানালার শিক বাঁকিয়ে সেই পথে বেরিয়ে পড়ল।

এবার আর তাদের কে পায়!

বনহুর মনিরাকে নিয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়াল।

আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে তখন করুণ সুরে সানাই বেজে চলেছে।

বনহুর নববধূর সাজে সজ্জিত মনিরাকে তুলে নিল অশ্বপৃষ্ঠে। বাঁ হাতে মনিরাকে চেপে ধরে দক্ষিণ হাতে তাজের লাগাম টেনে ধরল।

বন-প্রান্তর পেরিয়ে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো তাজ।

মনিরার মনে অফুরন্ত আনন্দ। দক্ষিণ হাতে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বলল— চিরদিন এমনি করে যদি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারতাম!

বনহুর আবেগভরা কণ্ঠে বলে—তাই রয়েছ তুমি! মনিরা, কখনো তুমি আমার বুকের মধ্য থেকে দূরে সরে যাবে না।

এই তো আর একটু হলেই কোথায় থাকত তোমার মনিরা?

হয়ত তোমার চাচার ছেলের বৌ হতে, এই তো।

না। তার পূর্বে আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আয়োজন করে নিয়েছিলাম...

মনিরা! বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে বসেই মনিরাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরল।

মনিরা বুঝল, এখন তার কিছু বলা উচিত হবে না। হঠাৎ কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। তাই নিশ্চুপ রইল।

মনিরাকে নিয়ে বনহুর যখন চৌধুরীবাড়ি পৌঁছল তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। যদিও পাখিরা এখনও বাসা ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি, তবু

কলরব শুরু করেছে। নতুন দিনের মধুর পরশে মন তাদের খুশীতে ভরে উঠেছে। সুমিষ্ট স্বরে গান গাইছে ওরা।

বনহুর মনিরাকে সঙ্গে করে মায়ের সম্মুখে হাজির হল— মা, এই নাও তোমার মনিরাকে।

নিদ্রাহীন কোটরাগত চোখ দুটি তুলে তাকালেন মরিয়ম বেগম। মনিরাকে দেখে উচ্ছ্বাসিত আনন্দে বলে উঠলেন— এনেছিস বাবা, আমার হারানো রত্ন তুই ফিরিয়ে এনেছিস? কিন্তু আমার মায়ের এ বেশ কেন?

ভয় নেই মা, তুমি যা ভাবছ তা হয়নি। আর একটু বিলম্ব হলে হয়ত-----

হায় হায়, একি সর্বনাশটাই না হত। মনি যে একটা মতলব এটে তবেই মনিরাকে নিয়ে গেছেন আসগর আলী সাহেব তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বাবা মনির, শোন, একটা কথা শোন্, সরে আয় আমার পাশে।

বনহুর মায়ের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়— বল মা?

ওরে, তোকে আর আমি ছেড়ে দেব না। আজ মনিরার এই বিয়ের সাজ আমি বৃথা নষ্ট হতে দেব না।

মা!

হ্যাঁ, মনিরাকে তোর বিয়ে করতে হবে।

হ্যা!

মনির, আজ তোর কোনো আপত্তিই আমি শুনব না। মনিরাকে তোর বিয়ে করতেই হবে, নইলে আমি আজই আত্মহত্যা করব।

এ তুমি কি বলছো মা? বনহুর একবার মায়ের মুখে আর একবার মনিরার মুখের দিকে তাকায়।

মনিরার দু'চোখে অশ্রু ছলছল করছে। নিষ্পলক নয়নে এতক্ষণ বনহুরের দিকে তাকিয়ে ছিলো মনিরা, বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি নত করে নেয় সে।

বনহুর মায়ের দিকে তাকাল—তারপর স্তব্ধকণ্ঠে বলল— মনিরার সুন্দর জীবনটা তুমি নষ্ট কর না মা।

আমি জানি মনি তোকে ভালোবাসে, তোর সঙ্গে বিয়ে হলে সে অসুখী হবে না।

আমি যে মানুষ নামের কলঙ্ক। লোকসমাজে আমার যে কোন স্থান নেই। ভুল কর না মা, তুমি ভুল করো না—বনহুর মায়ের বিছানায় বসে পড়ে দু'হাতে নিজের মাথার চুল টানতে লাগল। অধর দংশন করতে লাগল সে।

মনিরা পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

মারিয়ম বেগম পুত্রের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান, পিঠে হাত রেখে বলেন—যত কথাই বলিস না কেন মনির আমার কথা তোকে রাখতেই হবে। বিয়ে তোকে করতেই হবে—করতেই হবে। নইলে আমি মাথা ঠুকে মরব---মরিয়ম বেগম ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করলেন।

বনহুর আর স্থির থাকতে পারল না, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মাকে ধরে ফেলল— চমকে উঠলো বনহুর, মায়ের ললাটে কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল সে— একি করলে মা!

না না, ছেড়ে দে আমায়; আমি আর বাঁচতে চাই না। মনিরাকে যদি অন্যের হাতে তুলে দিতে হয় তবে আমার মৃত্যুই ভাল:..

মা!

মনির, ওকে তুই বিয়ে কর।

বনহুর মাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে তাকাল মনিরার দিকে। মনিরার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। নীরব ভাষায় যেন বলছে—ওগো, তুমি সদয় হও। ওগো, তুমি সদয় হও! একটিবার ফিরে তাকাও দুনিয়ার দিকে..

বনহুর মনিরার দিকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে বলে ওঠে—তোমার কথাই সত্য হউক মা, মনিরাকে আমি বিয়ে করব।

এতক্ষণে মরিয়ম বেগমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি আঁচলে ললাটের রক্ত মুছে ফেলে বললেন— আমাকে বাঁচালি বাবা। দাঁড়া, তুই যেন আবার পালিয়ে যাসনে—-মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যান।

সরকার সাহেব তাঁর নিজের কামরায় ঘুমিয়ে ছিলেন। মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে ডাকেন—সরকার সাহেব, উঠুন তো?

ধড়মড় করে উঠে বসেন সরকার সাহেব, চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হন। হঠাৎ রাতের বেলায় বেগম সাহেবা, কারণ কি? ঢোক গিলে বললেন—আপনি!

মরিয়ম বেগম বললেন— আমার সঙ্গে আসুন দেখি।

কি হয়েছে বেগম সাহেবা?

আসুন, পরে বলছি।

মরিয়ম বেগম এগিয়ে চলেন, তাঁকে অনুসরণ করেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মরিয়ম বেগম নিজের কক্ষে প্রবেশ করে, ডাকেন— আসুন সরকার সাহেব।

বনহুরের চোখে-মুখে বিস্ময়, মা তার কি করতে কি করে বসলেন। সরকার সাহেবকে আবার কেন ডাকলেন ভেবে পায় না সে।

ততক্ষণে সরকার সাহেব কক্ষে প্রবেশ করে বনহুরকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠেন। এ কে? বনহুরের শরীরে কালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, কোমরের বেল্টে রিভলভার— সরকার সাহেব ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তো কোনদিন বনহুরকে দেখেননি তাই ঘাবড়ানোটা স্বাভাবিক। তারপর মনিরাকে দেখতে পেয়ে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হলেন। কিছু বুঝতে না পেরে তাকলেন মরিয়ম বেগমের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন— সরকার সাহেব, একে চিনতে পারেননি? পারবেনই বা কি করে! ভাল করে একবার ওর দিকে চেয়ে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।

সরকার সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন— কই না, ওকে তো আমি কোনদিন দেখিনি।

এবার মরিয়ম বেগম বললেন—আমার মনিরকে আপনার মনে আছে সরকার সাহেব?

তা থাকবে না? মনির—সে যে আমাদের সকলের নয়নের মনি ছিল বেগম সাহেবা।

সেই নয়নের মনি, আমার প্রাণের প্রাণ মনির আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন সরকার সাহেব—মনির!

হ্যাঁ, আমার মনির।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবের চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরকে বুকে টেনে নেন। বনহুর নীরবে সরকার সাহেবের কাঁধে মাথা রাখে।

সরকার সাহেবের সেকি আনন্দ! উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললেন— কোথায় ছিলে বাবা তুমি এতদিন? তা ছাড়া মা মনিরাই বা-----

মরিয়ম বেগম বললেন— সব পরে বলবো আপনাকে সরকার সাহেব। আজ খুব তাড়াতাড়ি একটা কাজ করতে হবে।

বলুন বেগম সাহেবা?

মনিরাকে ওর বড় চাচা তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিলেন— মনির সেই বিয়ের মঞ্চ থেকে মাকে আমার নিয়ে এসেছে। আমি চাই মনিরের সঙ্গে এক্ষুণি মনিরার বিয়েটা শেষ করতে।

এক্ষুণি!

হ্যাঁ আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয় সরকার সাহেব। রাত ভোর হবার আর দেরী নেই, তার পূর্বেই আমি ওদের বিয়ে দিতে চাই। আমি জানি আপনি আরও অনেক জায়গায় বিয়ে পড়িয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনার ভুল হবে না।

তা হবে না কিন্তু এত তাড়াহুড়া করে—

আর কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না সরকার সাহেব। দেখছেন না মনিরার শরীরে বিয়ের পোশাক—

সরকার সাহেব ওজু বানিয়ে কেতাব নিয়ে আসলেন। মনিরা আর দস্যু বনহুরকে পাশাপাশি বসিয়ে বিয়ের কলেমা পাঠ করলেন।

মরিয়ম বেগম নীরবে আশীর্বাদ করে চললেন।

ওদিকে ভোরের আজানধ্বনি ভেসে এলো—আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

দস্যু বনহুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মনিরার।

পাখিরা তখন নীড় ছেড়ে মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছে।

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলল— মনিরা এ তুমি কি করলে?

সবচেয়ে যা আমার মঙ্গলময় তাই করলাম।

সুখী হবে কি?

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলল—আমার মত সুখী কে!

বনহুর আর মনিরাকে একা রেখে, বেরিয়ে গিয়েছিলেন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব। বিয়ের পর ওদের দু'জনের কাছে দু'জনের যা বলবার থাকে বলে নিক ওরা।

এবার বনহুর বিদায় চাইল মনিরার কাছে— আসি তবে?

এসো। ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো মনিরার মুখ থেকে।

স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে সরে দাঁড়াল মনিরা।

বনহুর একবার মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

❑

মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে গোপনে সব খুলে বললেন বারবার অনুরোধ করলেন—দেখুন সরকার সাহেব, এ কথা যেন কোনদিন কাউকে বলবেন না। শুধু সাক্ষী রইল আল্লাহ আর আপনি ও আমি।

সরকার সাহেব বললেন— আমি কোনদিন কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করব না।

এখানে যখন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব কথাবার্তা বলছিলেন, তখন আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড-পাত্রী উধাও হয়েছে।

গোটা পাড়া তন্নতন্ন করে খোঁজা হল—কিন্তু কোথাও মনিরাকে পাওয়া গেল না।

আসগর আলী সাহেব তো রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন। তাঁর এতবড় আয়োজন সব পণ্ড হয়ে গেল। তাছাড়া মনিরা গেল কোথায়—এই চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে তুলল। বাড়ির সকলকে ধমকানো শুরু করলেন কেন তাকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যে চলে গেছে তাকে কি আর এত সহজে পাওয়া যায়! আসগর আলী সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আসগর আলী সাহেবের স্ত্রী মনিরার বড় চাচীর অবস্থাও তাই। অনেক আশা করেই তিনি আজ মনিরার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিতে চলেছিলেন।

আসগর আলী সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর যত রাগ গিয়ে পড়ল মনিরার মামীমা মরিয়ম বেগমের ওপর। নিশ্চয়ই তাঁরই কোন চক্রান্তে মনিরা পালিয়েছে। কিন্তু মনিরা যেখানেই থাক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তার বিয়েও হবে শহীদের সঙ্গে। মনিরা তাদেরই মেয়ে; কোনো অধিকার নেই তার ওপর চৌধুরীবাড়ির কারও।

শহীদ তো হাউমাউ করে কাঁদা শুরু করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে বিলাপের মত বলছে—আমার বৌ কোথায় পালিয়েছে? আমার বৌ কে নিয়ে গেছে? আমি তার মাথা আস্ত রাখব না। এমনি নানারকম আবোল তাবোল বলতে শুরু করেছে শহীদ।

আসগর আলী সাহেবের স্ত্রী পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— কাঁদিস না বাপু, মনিরা তোরই বৌ, কে তাকে নিতে পারে। কালই আমি তোর আব্বাকে চৌধুরীবাড়ি পাঠাব, কাঁদিস না বাপ।

আসগর আলী সাহেব তখনই লোক পাঠালেন চৌধুরীবাড়িতে—যা দেখে আয় মনিরা সেখানে গেছে কিনা।

কেউ কেউ বলল মেয়ে মানুষ রাতারাতি যাবে কি করে? হয়তো পাড়ার কোথাও লুকিয়ে আছে। কিংবা কোথাও পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেনি তো?

আঁতকে উঠলেন আসগর আলী সাহেব, বললেন— হতেও পারে!

গ্রামের সমস্ত খাল-বিল-পুকুর খুঁজে দেখতে শুরু করলেন। জাল ফেলে দেখলেন কিন্তু কোথাও মনিরাকে পাওয়া গেল না। জীবিত কিংবা মৃত যে কোন অবস্থায় ওকে পেতেন তাতেই খুশি হতেন আসগর আলী সাহেব। তাঁর মনের বাসনা মনিরার সমস্ত বিষয় আসয় আত্মসাৎ করা।

❑

চৌধুরীবাড়ির পেছনে কবরস্থান। ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন জায়গাটা। আম কাঁঠালের সারি একপাশে জামরুল আর জলপাই গাছ। পাশেই একটা চাঁপাফুলের গাছ, তারই তালায় চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন চৌধুরী সাহেব।

কিছুক্ষণ পূর্বে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে ঘন মেঘের চাপ জমাট বেঁধে রয়েছে। মাঝে মাঝে পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে শুকনো পাতার ওপর। তারই মৃদু শব্দের মধ্যে শুনা যাচ্ছে ঝি ঝি পোকার অবিশ্রান্ত আওয়াজ।

বৃষ্টি ধরে গেছে অনেকক্ষণ তবু আকাশে ঘন কালো মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের চমকানি। যেন অশ্বারোহীর হাতের চাবুকের মত এখনও ছুটে বেড়াচ্ছে—

রাত গভীর। গোটা শহর ঝিমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে অজানিত ভ্রমণকারী মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

এমন সময় চৌধুরীবাড়ির পেছনে কবরস্থানের পথ বেয়ে এগিয়ে এলো ছায়ামূর্তি। ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। বিদ্যুতের আলোতে বড় অদ্ভুত লাগছে তাকে।

আম-কাঁঠালের ছায়া এসে থমকে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি। আবার বৃষ্টি নামলো। খুব বেশি নয় টুপ টুপ ঝরছে কোনো শোকাতুরা জননীর অশ্রুবিন্দুর মত।

ছায়ামূর্তি আরও কয়েক পা এগুলো। ঠিক চৌধুরী সাহেবের কবরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাপড়ের ভেতর থেকে বের করলো একটা ধারালো অস্ত্র। এবার চৌধুরী সাহেবের কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ছায়ামূর্তি। তারপর দ্রুত মাটি সরাতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন পুলিশসহ মিঃ জাফরী ছায়ামূর্তির সম্মুখে আচমকা এসে দাঁড়ালেন, রিভলভার উদ্যত করে গর্জে উঠলেন— কে তুমি?

ছায়ামূর্তি ধারালো অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়াল।

জমকালো আলখেল্লায় তার সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশ বাহিনীর হাতে উদ্যত রিভলভার। মিঃ হারুন টর্চের আলো ফেললেন ছায়ামূর্তির মুখে।

টর্চের তীব্র আলোতে আলখেল্লার মধ্যে দু'টি চোখ শুধু জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল।

মিঃ জাফরী ছায়ামূর্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

মিঃ হারুন স্বয়ং ছায়ামূর্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে পুলিশ ফোর্স তাকে ঘিরে ধরেছে।

❑

ছায়ামূর্তিকে বন্দী অবস্থায় পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সকল অফিসার একত্রিত হয়ে ছায়ামূর্তিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের হাতেই গুলিভরা রিভলভার। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ গোপাল উপস্থিত রয়েছেন সেখানে। সকলেরই চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ— কে এই ছায়ামূর্তি?

মিঃ জাফরী স্বয়ং এগিয়ে এলেন ছায়ামূর্তির পাশে। কালো আলখেল্লায় ঢাকা চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে বললেন—কে তুমি ছায়ামূর্তি—জবাব দাও?

সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি তার মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলল।

কক্ষে একটা বাজ পড়লেও এভাবে সবাই চমকে উঠতো না, সবাই বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ শঙ্কর রাও —মিঃ আলম! আপনি ছায়ামূর্তি।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল সবচেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে, তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন— প্রথম থেকেই আমি এই রকম একটা সন্দেহ করেছিলাম।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— মিঃ আলম, আপনিই তাহলে খুনী।

খুনী যে আমি নই, এ কথা বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন কি? করবেন না নিশ্চয়ই। নিজে খুনী সেজেই আমি আসল খুনীর সন্ধান করছিলাম এবং সফলতা লাভ করেছি।

কক্ষে আবার একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল অনেকটা প্রসন্ন হয়ে এসেছে। মিঃ আলমের হাত হাতকড়া লাগানোর জন্য একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু চট করে হাতকড়া খুলে দেবার অনুমতিও দিতে পারছিলেন না। সবাই নিজ নিজ রিভলভার সংযত করে খাপের মধ্যে পুরে রেখেছিলেন। পুলিশরাও অফিসারগণকে অস্ত্রসংবরণ করতে দেখে তারাও নিজ নিজ রাইফেল নামিয়ে নেয়। মিঃ জাফরী নিজ হাতে মিঃ আলমের হাতের হাতকড়া খুলে দেন।

কক্ষস্থ সবাই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। তাঁরা জানতে চান কে এই খুনী যে একসঙ্গে তিন তিনটা খুন করতে পারে।

মিঃ আলম বলে চললেন— প্রথমতঃ চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী এবং ডক্টর জয়ন্ত সেন ও ভগবৎসিংবেশি নাথুরামের হত্যাকারী এক নয়। দ্বিতীয়তঃ চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী ডক্টর জয়ন্ত সেন। তৃতীয়তঃ চৌধুরী সাহেবকে হত্যা করতে জয়ন্ত সেনকে বাধ্য করেছিলো ভগবৎসিংবেশী নাথুরাম এবং এদের সবাইকে পরিচালিত করেছিল খান বাহাদুর সাহেবের ছেলে মুরাদ।

মিঃ জাফরী কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন—তাহলে ডক্টর জয়ন্ত সেন আর নাথুরামকে মুরাদই হত্যা করেছে বলে মনে করেন?

মিঃ আলম একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—না, মুরাদ হত্যাকারী নয়, তবে তার নির্দেশেই এসব ঘটেছে এবং তার উদ্দেশ্য ছিলো চৌধুরী সাহেবকে পরপারে পাঠিয়ে তাঁর একমাত্র ভাগিনী মিস মনিরাকে হস্তগত করা; কিন্তু সে আশা তার সফল হয়নি। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে!

মিঃ হারুন বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন—কি বললেন মুরাদকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

হ্যাঁ মিঃ হারুন আপনি স্বয়ং তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তার মানে।

মানে ভগবৎসিংবশী নাথুরামের বাড়িতে তার আত্মীয়ের বেশে জয়সিংকে গ্রেফতারের কথা আপনার স্মরণ আছে ইন্সপেক্টার?

হ্যাঁ, জয়সিং নামে এক ব্যক্তিকে আমরা সেদিন গ্রেপ্তফতর করেছিলাম। এখনও সে জেলে আটক রয়েছে।

সেই জয়সিং খান বাহাদুর সাহেবের একমাত্র সন্তান মুরাদ।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন— মুরাদ তাহলে বন্দী হয়েছে, যাক তাহলে একটা দিক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু আপনি রাতদুপুরে চৌধুরী সাহেবের কবরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কেন মাটি সরাচ্ছিলেন জানতে পারি কি?

আমি চৌধুরী সাহেবের কবর থেকে তাঁর একখানা হাড় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম—কারণ আমি পরীক্ষা করে জানতে চাই তাঁকে কি ধরনের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। হাড় সংগ্রহ করতে আমাকে কবরস্থানে গোপনে যেতে হয়েছিল।

এতক্ষণে কক্ষস্থ সকলের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হলো।

হঠাৎ জাফরী এবার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে বসলেন— মিঃ আলম, এবার বলুন ডক্টর জয়ন্ত সেন আর নাথুরামের হত্যাকারী কে?

হঠাৎ মিঃ আলম হো! হো! করে হেসে উঠলেন, তার সুন্দর মুখমণ্ডল দীপ্ত হলো, পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে পড়লেন তিনি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে

বললেন—পিতার হত্যাকারীকে পুত্র হত্যা করেছে। ডক্টর জয়ন্ত সেন ও শয়তান নাথুরামকে হত্যা করেছে দস্যু বনহুর।

সকলেই একসঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন—দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ আসল হত্যাকারী দস্যু বনহুর।

মিঃ জাফরী মিঃ আলমের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন, বললেন—সত্যি, আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। মিঃ আলম, আপনি যে এত সুন্দরভাবে এই হত্যারহস্য উদঘাটন করেছেন তার জন্য আপনাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কক্ষস্থ অন্যান্য অফিসার মিঃ আলমের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

মিঃ আলম কিন্তু তাঁর ছায়ামূর্তির ড্রেস পূর্বেই খুলে ফেলেছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবার আমি বিদায় গ্রহণ করছি। গুড নাইট।

কেউ কোনো কথা উচ্চারণ করার পূর্বেই মিঃ আলম কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ হারুনের দৃষ্টি মিঃ আলমের পরিত্যক্ত ছায়ামূর্তির আলখেল্লাটার উপরে গিয়ে পড়ল। তিনি হেসে বললেন—মিঃ আলমের ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই ফেলে গেলেন।

মিঃ শঙ্কর রাও উঠে গিয়ে আলখেল্লাটা হাতে উঠিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখছেন, হঠাৎ মিঃ জাফরী বলে ওঠেন—ওটা কি? একখণ্ড কাগজ যেন পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে আলখেল্লার গায়ে।

তাইতো! মিঃ শঙ্কর রাও কাগজের টুকরাখানা আলখেল্লা থেকে খুলে নিলেনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারার ভাব বদলে গেল, বিস্মিতকণ্ঠে বললেন একি! দস্যু বনহুরই মিঃ আলম ও ছায়ামূর্তি।

কি বলছেন! মিঃ জাফরী তাড়াতাড়ি শঙ্কর রাওয়ের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে— 'দস্যু বনহুর'।

মিঃ জাফরী থ' মেরে গেলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

আর সবাই নির্বাক, নিশ্চুপ, হতভম্ব। সহসা মিঃ হারুন চিৎকার করে বললেন—পাকড়াও করো, মিঃ আলমকে পাকড়াও করো ---- গ্রেফতার করো ....

সমস্ত পুলিশ উদ্যত রাইফেল হাতে ছুটল।

কিন্তু মিঃ আলমবেশি দস্যু বনহুর তখন কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে।

পরবর্তী বই

মনিরা ও দস্যু বনহুর